সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি নং - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

বর্ষ : ৬৪
সংখ্যা : ৩৭-৩৮
বার : সোমবার

১৯ জুন- ২০২৩ ঈসায়ী
০৫ আষাঢ়- ১৪৩০ বাংলা
২৯ জিলক্বদ- ১৪৪৪ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	:	০১৭৬১৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	:	০১৯৩৩৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	:	০১৭১৬৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০১	টেলিফোন	:	০২-৭৫৪২৪৩৪

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

weeklyarafat@gmail.com
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.weeklyarafat.com
www.jamiyat.org.bd
Shaptahik Arafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- ✍ **সম্পাদকীয়** ০৩
- ✍ **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **কুরবানী আত্মত্যাগের এক অনুপম দৃষ্টান্ত**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৫
- ☐ **প্রিয় নবী (ﷺ)-এর প্রিয় কথা** ০৯
- ✍ **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **নেপালে বাঙালি মুসলমানদের বসতি : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা**
    আবু সা'আদ ড. মো. ওসমান গনী- ১০
  - ❖ **কুরবানীর পশু জবেহ্র সঠিক পদ্ধতি ও উত্তম সময়**
    আবু মুহান্নাদ- ১৫
  - ❖ **ইসলামের পঞ্চম খলীফার হাদীস সংগ্রহ অভিযান**
    অধ্যাপিকা হাফিজা লোকমান- ১৭
- ✍ **ক্বাসাসুল হাদীস :**
  - ❖ **ওহশী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হত্যার ক্ষতিপূরণ**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২১
- ✍ **বিশেষ মাসায়িল** ২৩
- ✍ **সমাজচিন্তা :**
  - ❖ **ইসলামে বৃক্ষরোপণ : অন্যতম সাদাক্বায়ে জারিয়াহ**
    বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ শামসুল হুদা- ২৬
- ✍ **আত্মগঠন :**
  - ❖ **মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষার নানান দিক**
    মো. আরিফুর রহমান- ২৯
- ✍ **বিস্ময়-বৈচিত্র :**
  - ❖ **ক্বলব বা অন্তর : মানবদেহের কেন্দ্রবিন্দু**
    মো. হারুনুর রশিদ- ৩২
- ✍ **ইতিহাস-ঐতিহ্য :**
  - ❖ **ঐতিহাসিক গাদীরে খুম খ্রিষ্টানদের সাথে নবী (ﷺ)-এর মুবাহালা**
    শেখ আহসান উদ্দিন- ৩৫
- ✍ **কিশোর ভূবন :**
  - ❖ **উম্মে মাবাদের তাঁবুতে রাসূল (ﷺ)**
    আবু তাসনীম- ৩৭
- ✍ **কবিতা** ৩৮
- ✍ **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৯
- ☐ **স্বাস্থ্য-সচেতনতা** ৪১
- ✍ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪২
- ✍ **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৭

সম্পাদকীয়

কুরবানীর তাৎপর্য ও শিক্ষা

কুরবানী একটি ত্যাগ ও ঈমান দীপ্ত 'আমলের নাম। যা যুগ পরম্পরায় এযাবৎকাল সুচারুরূপে এবং ঈমানী ভাব গাম্ভীর্যে সমেত সু-প্রতিষ্ঠা পেয়ে আসছে। আল্লাহ তা'আলা এ গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদতটি সর্বযুগে সব উম্মতের উপর জারি রেখেছেন। ধরন ও প্রকৃতি কিংবা পদ্ধতির ভিন্নতা থাকতে পারে; কিন্তু মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার ও তার সান্নিধ্যে পৌঁছার মাধ্যম হিসাবে কুরবানী অতি তাৎপর্যপূর্ণ 'আমল। এটি হতে পারে সময়, শ্রম ও অর্থ ত্যাগ এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য প্রত্যাশা। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্রদ্বয় হাবিল ও কাবিল কুরবানীর আদেশ প্রাপ্ত হয়ে তা বাস্তবায়ন করেছিলেন। তাদের একজনের কুরবানী মহান আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়ার প্রমাণ মিললে অপরজন অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। তখন একনিষ্ঠ ঈমানদার অপর ভ্রাতা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন : আল্লাহ তা'আলা তো কেবল মুত্তাকিদের কাছ থেকেই কবুল করে থাকেন। এর অর্থ দাঁড়ায় কুরবানী হচ্ছে তাক্বওয়ার পরীক্ষা। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন : তোমাদের কুরবানীর পশুর রক্ত ও মাংস আমার কাছে পৌঁছায় না; পৌঁছায় কেবল তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতি।

মানুষের মধ্যে দু'টি স্বভাব রয়েছে। একটি হচ্ছে মনুষ্যত্ব আর অপরটি হচ্ছে পশুত্ব। মনুষ্যত্বের চর্চা এবং বিকাশ একান্ত কাম্য। পশুত্বের উপরে মনুষ্যত্বের বিজয় স্মর্তব্য। যারা মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়াকে ভয় করে এবং প্রবৃত্তির তাড়না হতে নিজেকে নিবৃত রেখে পবিত্র জীবন-যাপন করতে পারে, তারাই কেবল মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিবেচিত হবে। আর এরূপ ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা উত্তম পারিতোষিক হিসাবে জান্নাতকে সুসজ্জিত করে রেখেছেন। পক্ষান্তরে যে অহংকারী হবে এবং দুনিয়াবী সুখ-স্বাচ্ছন্দকে অগ্রাধিকার দেবে, সে পশুত্বের স্বভাবে সংক্রমিত এবং এর পরিণতিস্বরূপ জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। তাই তো আল্লাহ তা'আলা আত্মশুদ্ধি অর্জনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বারবার সংযমশীল হতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এমন কিছু 'আমল আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন, যার মাধ্যমে আমরা তাক্বওয়াবান হতে পারি। এসব সুযোগের মধ্যে অন্যতম কুরবানী।

কুরবানী হতে হবে প্রিয় বস্তু। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে।" সেজন্য ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) আদিষ্ট হয়েছিলেন কলিজার টুকরা সন্তান ইসমা'ঈলকে কুরবানী করতে– যখন প্রস্তুত হলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ত্যাগ ও প্রস্তুতিকে গ্রহণ করে তার বিনিময়ে পশু কুরবানীর বিধান জারি করলেন এবং বলে দিলেন– ইব্রাহীম! তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছ। পুত্রকে আর জবাই করতে হবে না। এই নাও, একটি পশু, তা কুরবানী করো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন– "কুরবানীর ধারাবাহিকতা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বলবৎ থাকবে।"

আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ) নিজে কুরবানী করেছেন। কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছেন। তার স্ত্রীগণ করেছেন, পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরাম করেছেন এবং আজও পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। মনে রাখতে হবে যে, প্রিয় নবী (ﷺ) কুরবানীর গুরুত্ব বুঝাতে তার বিদায় হজ্জে মিনা উপত্যকায় একশত উট নাহর করেছিলেন। এর মাধ্যমে উম্মতকে বুঝিয়ে দিলেন যে, কুরবানী মহান আল্লাহর প্রিয় একটি 'ইবাদত। যেন এ ব্যাপারে কেউ কার্পণ্য না করে। এমনকি এও বলে দিলেন যে, যার সামর্থ্য আছে অথচ কুরবানী করেনি, সে যেন আমাদের ঈদের সালাতে না আসে। তার এই উক্তির মাধ্যমে এ কথাও প্রমাণিত যে, সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা কুরবানী না করলে এটি একটি অকল্যাণকর এবং বিধি বহির্ভূত কর্ম বলে বিবেচিত হবে। এজন্য একদল আলেম কুরবানী করাকে ওয়াজিব মনে করেন। আবার কেউ কেউ এটিকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলে আখ্যা দেন।

মোদ্দাকথা, কুরবানী একটি তাৎপর্যপূর্ণ 'ইবাদত। সামর্থ্যবান কোনো মুসলিমের জন্য এ নিয়ে কোনো অবহেলা করা কিছুতেই সমীচীন নয়। কুরবানীর দিনে মুসলিম নর-নারী ঈদুল আযহার সালাত আদায় করতে উন্মুক্ত ময়দানে সমবেত হবেন, সালাত আদায় করবেন, খুতবাহ্ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, মুসলিমদের বিশাল জামা'আত প্রত্যক্ষ করবেন এবং দু'আয় শামিল হবেন। অতঃপর নিজ অবস্থানস্থলে ফিরে এসে শরিয়ত নির্ধারিত পশু কুরবানী করবেন। এ সময়ে কুরবানীদাতা প্রত্যেক মুসলিম মহান আল্লাহর নাম নেবেন, তাকবীর ধ্বনি দেবেন

এবং মহান আল্লাহর দেওয়া তাওফীক অনুসারে উৎসর্গকৃত কুরবানী যেন আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন সে প্রার্থনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখবেন। একই সাথে হবে মহান আল্লাহর নাম, তাকবীর ও প্রার্থনা। কতই না সুন্দর 'ইবাদত! পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিম একই নিয়মে 'ইবাদত পালন করবেন। ঘোষিত হবে সর্বত্র তাওহীদের নিনাদ, মুখরিত হবে মুসলিম সমাজের অলিগলি তাকবির ধ্বনিতে। কি সুন্দর! কি ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ এক আবহ! যা ভাষায় ব্যক্ত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

মানুষের মাঝে কুরবানীর এই 'ইবাদত যেমন মহান আল্লাহর একত্ববাদকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনি মহান আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করার সুবাদে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় নিজেকে নিয়োজিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞ বান্দাদের পছন্দ করেন। তিনি বলে দিয়েছেন : তোমাদের রবের ঘোষণা– তোমরা যদি শুকরিয়া আদায় করো, তাহলে আমি বাড়িয়ে দেব। পক্ষান্তরে যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে জেনে রাখো আমার শাস্তি বড়ই কঠিন। কুরবানীর মাধ্যমে একজন মুসলিম যেমন তার তাওহীদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে, তেমনি মহান আল্লাহর দেওয়া এ জিয়াফত গ্রহণ করে পরিবার পরিজনসহ পাড়া-প্রতিবেশী ও হতদরিদ্র সর্বশ্রেণীর মানুষকে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাংস খাওয়ার সুযোগ করে দেবে। এতে তার হৃদয়ের প্রশস্ততা প্রমাণিত হবে এবং আল্লাহ তা'আলা খুশি হবেন। যাদের কুরবানী এ লক্ষ্যে সম্পাদিত হবে তারাই সার্থক ও সফল মুসলিম। আমরা সাপ্তাহিক আরাফাত পরিবারবর্গ আসন্ন কুরবানীর আমেজকে তাওহীদী চেতনায় জাগ্রত করার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে মুসলিম উম্মাহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের ও আমাদের নেক 'আমলকে কবুল করুন –আমীন। ❑

সৌদি বাদশাহ'র আমন্ত্রণে
মাননীয় জমঈয়ত সভাপতির হজ্জ সফর

সৌদি আরবের মহামান্য বাদশাহ্ সালমান বিন আব্দুল আযীয আলে-সাউদ-এর আমন্ত্রণ পেয়ে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ২০ জুন দিবাগত রাত ১টায় সৌদি এয়ারলাইন্স-যোগে কাবার পথে রওনা হবেন। সৌদি আরব পৌঁছে তিনি প্রথমে 'উমরাহ্ এরপর নির্ধারিত দিনসমূহে হজ্জ পালন করবেন।

রাজকীয় মেহমান হিসেবে মাননীয় সভাপতি সৌদি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও শাইখ-মাশায়েখদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করে বাংলাদেশ এবং জমঈয়তে আহলে হাদীসের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কথা বলবেন। এছাড়াও তিনি প্রবাসী জমঈয়তের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় ও বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করবেন বলেও কর্মসূচি নির্ধারণ করেছেন।

মাননীয় সভাপতিকে রাজকীয় মেহমান হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তিনি সৌদি বাদশাহ্ সালমান বিন আব্দুল আযীয আলে-সাউদ, প্রধানমন্ত্রী যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান, ধর্মমন্ত্রী শাইখ ড. আব্দুল লতীফ বিন আব্দুল আযীয আলুশ্-শাইখ, ধর্মসচিব শাইখ ড. আওয়াদ আল আনেযী, সৌদি রাষ্ট্রদূত ঈসা ইউসুফ আদ দুহায়লান এবং রিলিজিয়াস এটাশে মোবারক আল আনেযী-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানিয়েছেন। তিনি সকলের দু'আপ্রার্থী।

উল্লেখ্য যে, মাননীয় সভাপতি ইতোপূর্বে জমঈয়তের উচ্চ পর্যায়ের চার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়ে সৌদি ধর্মমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন।

আল কুরআনুল হাকীম

কুরবানী আত্মত্যাগের এক অনুপম দৃষ্টান্ত

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"আর তুমি তাদের কাছে যথাযথভাবে আদমের দুই ছেলের বর্ণনা করো, যখন তারা দু'জনে কুরবানী পেশ করলো। অতঃপর তাদের একজনের কুরবানী গ্রহণ করা হলো আর অন্য জনের কুরবানী গ্রহণ করা হলো না। সে (যার কুরবানী কবুল হলো না) বলল, অবশ্যই আমি তোমাকে (যার কুরবানী কবুল হয়েছিল) হত্যা করবো। সে বলল, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের থেকে (কুরবানী) গ্রহণ করেন।"[১]

শাব্দিক অনুবাদ

وَ-আর/এবং, اُتْلُ-তুমি বর্ণনা করো, عَلَيْهِمْ-তাদের কাছে, نَبَأَ-সংবাদ, ابْنَيْ اٰدَمَ-আদম সন্তানের, بِالْحَقِّ-যথাযথভাবে/সঠিকভাবে, اِذْ-যখন, قَرَّبَا-তারা দু'জনে নিকটবর্তী হলো, قُرْبَانًا-কুরবানীর, فَتُقُبِّلَ-কবুল করা হয়েছিল, مِنْ-হতে/থেকে, اَحَدِهِمَا-তাদের একজনের, وَ-আর/এবং, لَمْ يُتَقَبَّلْ-কবুল করা হয়নি, مِنَ-হতে/থেকে, الْاٰخَرِ-অন্যজন, قَالَ-সে বলল, لَاَقْتُلَنَّكَ-অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করবো, قَالَ-সে বলল, اِنَّمَا-নিশ্চয় যা, يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ-আল্লাহ কবুল করেন, مِنْ-হতে/থেকে, الْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাক্বী/আল্লাহভীরু।

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

দরসে বর্ণিত আয়াতটি সূরা আল মায়িদাহ্'র ২৭ নং আয়াত। সূরা আল মায়িদাহ্ কুরআনুল কারীমের পাঁচ নম্বর সূরা। এই সূরার ১৫নং রুকুর ১১২নং আয়াতে উল্লেখিত مَائِدَةً শব্দটি থেকে এই সূরাটির নাম করণ করা হয়েছে। অধিকাংশ সূরার নামের মতো এই সূরার নামের সাথেও এর বিষয়বস্তুর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। নিছক অন্যান্য সূরা থেকে আলাদা করার জন্য একে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। বর্ণনার ধারাবাহিকতা থেকে বুঝা যায় এই সূরাটি একটি মাত্র ভাষণের অন্তর্ভুক্ত এবং সম্পূর্ণ সূরাটি একই সংগে নাযিল হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে অথবা ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে সূরাটি নাযিল হয়। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা এর সত্যতা প্রমাণ করে। এই সূরায় মুসলমানদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিধি-বিধানসহ হজ্জ সফরের রীতি-নীতি ও পানাহার দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে হালাল-হারামের চূড়ান্ত সীমা নির্ধারিত হয়। এই সূরায় আহলে কিতাবদের সাথে পানাহার ও তাদের মেয়েদের বিয়ে করার অনুমতি প্রদানসহ ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুম করার রীতি-পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। বিদ্রোহ ও অরাজকতা সৃষ্টি এবং চুরি-ডাকাতির শাস্তি ও সাক্ষ্য প্রদানের আরো কয়েকটি ধারাসহ কসম ভাঙার কাফ্ফারার বিষয়ে আলোচ্য সূরায় আলোচিত হয়।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ﴾

"আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্রদ্বয়ের ঘটনা তুমি তাদের কাছে যথাযথভাবে বর্ণনা করো।"

আল্লাহ তা'আলার এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায় আদম (আলাইহিস সালাম) পুত্রদ্বয়ের ঘটনা তৎকালীন সময়ে মানুষের কাছে বিকৃতভাবে প্রচার হয়েছিল। কুরআন কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয় যে, সে অতীতের কোনো ঘটনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করবে। তবে অতীতের কোনো বিকৃত ঘটনার প্রকৃতরূপ কিংবা যে ঘটনার মাঝে যতটুকুতে মানুষের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে মানুষের প্রয়োজনে ততটুকু ঘটনা কুরআন বর্ণনা করেছে। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্রদ্বয়ের কাহিনীটিও এই বিজ্ঞ রীতির ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে।

তৎকালীন সময়ে সমাজে প্রচলিত ঘটনাটির বিকৃতরূপ

বাইবেলের জেনেসিসের চার নম্বর অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে আদম (আলাইহিস সালাম) তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলে সে গর্ভবতী হয় এবং তারপর কেইন (কাবীলের) জন্ম হয়। কেইন ছিল কৃষক।

---

* *প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[১] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ২৭।*

তখন সে বলল, ঈশ্বর (আল্লাহ) আমাকে একটি পুত্র সন্তান দিয়েছে। তারপর কেইন (কাবীলের) ভাই এবেল (হাবীলের) জন্ম হয়। আর এই এবেল (হাবীল) ভেড়া-বকরি চরাত। কেইন তার ভাই এবেলকে মাঠে নিয়ে হত্যা করে। এরফলে সদাপ্রভূ তাকে বলে তুমি যেই জমিই চাষ করো না কেন তাতে ফসল ফলবে না। তুমি পলাতক হয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে। তখন কেইন সদাপ্রভুর কাছে আরজ করলো– পৃথিবীতে যে আমাকে দেখবে সে আমাকে হত্যা করবে। তখন সদাপ্রভু বলল, পৃথিবীতে যে তোমাকে হত্যা করবে তার উপর সাতগুণ প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এরপর সদাপ্রভু তার উপর একটি চিহ্নের ব্যবস্থা করে দেন যাতে মানুষজন তাকে চিনতে না পারে। তারপর সে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাইবেলের এই বর্ণনাটি যথাযথ নয়। তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে– কাবিলকে অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। সে এডেনের পূর্ব দিকে অবস্থিত নুদ অঞ্চলে বসবাস করে যাকে তারা 'কান্নীম' নামে চিনে। অন্য এক বর্ণনায় দামেশকের উত্তর সীমান্তে কাসিউন পাহাড়ের সন্নিকটে একটি বধ্যভূমি রয়েছে বলে কথিত আছে এই স্থানটিকে মাগারাতুদ দাম বলা হয়ে থাকে সেখানেই কাবিল তার ভাই হবিলকে খুন করেছিল।

ঘটনাটির প্রকৃতরূপ : যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো অন্য জনের কুরবানী কবুল হলো না। যার কুরবানী কবুল হলো না সে বলল– আমি তোমাকে হত্যা করবই। অন্য জন বলল– আল্লাহ তা'আলা মুত্তাক্বীদের কুরবানী কবুল করেন। আমাকে হত্যার জন্য আমার প্রতি তুমি হাত বাড়ালেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত বাড়াব না। আমি বিশ্বজাহানের প্রভু মহান আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই যে তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন করে জাহান্নামী হও আর এটাই যালিমদের কর্মফল। তারপর তার প্রবৃত্তি তাকে তার ভাইকে হত্যায় প্ররোচিত করল এবং সে তাকে হত্যা করল ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। তারপর আল্লাহ তা'আলা একটি কাক পাঠালেন, যে তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখানোর জন্য মাটি খুঁড়তে লাগলো। সে বলল হায়! আমি কি এই কাকটির মতো হতে পারলাম না যাতে আমি আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারি। অতঃপর সে অনুতপ্ত হলো।[২]

বর্তমানে মুসলিম সমাজে প্রচলিত হাবীল ও কাবীলের ঘটনা : হাবীল ও কাবীলের মধ্যে সুশ্রী বোনকে বিয়ে করার জন্য যে দ্বন্দ্ব হয় তারই যের ধরে তাদের মধ্যে হত্যাকান্ড সংঘঠিত হওয়ার যে ঘটনা প্রচলিত আছে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহের কোথাও সে ঘটনার অস্তিত্ব নেই। সেই ঘটনাটি এসেছে ইয়াহুদীদের কিংবদন্তী "Legends of the Jews"-এর Volume 1:3 থেকে। ধারণা করা হয় ইহুদী পণ্ডিত কা'ব আল-আহবার (যে পরবর্তীতে মুসলিম হয়েছিল) তার থেকে ঘটনাটি নকল করা হয়েছে।

সুদ্দী (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-সহ কতিপয় সাহাবী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আদম (আলাইহিস সালাম) এক গর্ভের পুত্র সন্তানের সঙ্গী অন্য গর্ভের কন্যা সন্তানের বিয়ে দিতেন। হাবীল সে মতে কাবীলের যমজ বোনকে বিয়ে করতে চাইলে কাবীল তা অস্বীকার করে সে তার যমজ বোনকে বিয়ে করতে চাইল। কারণ তার যমজ বোনটি ছিল অত্যাধিক রূপসী। আদম (আলাইহিস সালাম) হাবীলের সাথে কাবীলের যমজ বোনকে বিয়ে দিতে চাইলে কাবীল তা অগ্রাহ্য করলো। ফলে আদম (আলাইহিস সালাম) তাদের দু'জনকে কুরবানী করতে আদেশ করলেন।[৩]

ইবনু কাসীর বলেন যে, আদম পুত্রদ্বয়ের কুরবানী বিশেষ কোনো কারণ বশে ছিল না বা কোনো নারীঘটিত বিষয় এর মধ্যে জড়িত ছিল না। কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, ভ্রাতৃ হত্যার কারণ ছিল স্রেফ এই হিংসা বশতঃ যে, হাবীলের কুরবানী কবুল হয়েছিল, কিন্তু কাবীলের কুরবানী কবুল হয়নি।[৪]

﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ﴾

"তারা (আদমের দুই পুত্র হাবীল ও কাবীল) যখন কুরবানী পেশ করল তাদের একজনের কুরবানী গ্রহণ করা হলো অন্যজনের কুরবানী গৃহীত হলো না।"

কাবীল [আদম (আলাইহিস সালাম)-এর বড় সন্তান] ছিল একজন কৃষক সে কৃষি কাজ করত। কার্পণ্যের বশে সে তার উৎপাদিত নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের এক বোঝা শস্য কুরবানীর জন্য পেশ করলো। আর হাবীল ভেড়া-বকরি চড়াত। মহান আল্লাহকে ভালোবেসে তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় সে তার বকরি পাল হতে মোটা-তাজা ও পছন্দনীয় একটি ভেড়া/বকরি কুরবানী করলো।

উল্লেখ্য যে, সে যুগে কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন ছিল এই যে, আসমান থেকে একটি আগুন এসে কুরবানী নিয়ে

[২] *সূরা আল মায়িদাহ : ২৭-৩১।*

[৩] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৭।*

[৪] *তাফসীরে ইবনু কাসীর।*

অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানীকে উক্ত আগুন গ্রহণ করত না, সে কুরবানীকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হতো।

আকাশ থেকে আগুন এসে হাবীলের কুরবানীটি গ্রাস করলো আর কাবীলের কুরবানীটি এমনিতেই পড়ে রইল। এতে বুঝা গেলো হাবীলের কুরবানী আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– হাবীলের কুরবানী দেওয়া এই পশুটিই পরবর্তীতে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক ইসমা'ঈলকে কুরবানীর বিনিময় হিসেবে জান্নাত থেকে পাঠানো হয়। আর ঐদিকে কাবীলের কুরবানী আগুন গ্রাস করেনি বলে বুঝা গেলো তার কুরবানী কবুল হয়নি। এতে কাবীল ক্ষুব্ধ হলো। তাই সে তার ভাই হাবীলকে লক্ষ্য করে বললো– لَأَقْتُلَنَّكَ অর্থাৎ- আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব[৫]।

﴿قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ﴾

"সে বলল– নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাক্বী বান্দাদের কুরবানী কবুল করেন।"

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, তাক্বওয়া অর্জন কুরবানী কবুলের পূর্ব শর্ত। কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মূলতঃ তাক্বওয়ার পরীক্ষাই নেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন–

﴿لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾

"আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশ্ত ও রক্ত; বরং তার কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– আল্লাহর কসম! তাদের দুইজনের মধ্যে নিহত লোকটি-ই (অর্থাৎ- কাবীল) অধিকতর শক্তিশালী ছিল। তারপরও সে তার ভাই হাবীলকে উপদেশ দিয়ে মার্জিত ভাষায় বলল– "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাক্বওয়াশীল বান্দাদের থেকে (কুরবানী) কবুল করে থাকেন। তারপরও যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হও, তবুও আমি তোমাকে পাল্টা হত্যা করতে উদ্যত হব না। কেননা, আমি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।[৬]

কুরবানীর বিধান

আলোচ্য আয়াতে আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দুই পুত্রের কুরবানীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমের ৩৭ নং সূরা (সূরা আস্ সা-ফ্ফা-ত)-এর ১০২-১০৯ নং আয়াতে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে কুরবানীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ২২ নং সূরা (সূরা আল হজ্জ)-এর ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾

অর্থাৎ- "আর প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আমি কুরবানী নির্ধারণ করেছি।"

তাছাড়া মৌলিকভাবে কুরবানীর বিধান রয়েছে– ২ নং সূরা আল বাক্বারাহ্-র ১৯৬ নং আয়াতে। রয়েছে– ৪৮ নং সূরা ফাত্হ-র ২৫ নং আয়াতে ও ৬ নং সূরা আল আন'আম-এর ১৬১-১৬৩ নং আয়াতে। রয়েছে– সূরা আল কাউসার-এর ২ নং আয়াতে। এই বর্ণনাগুলো থেকে এই কথা স্পষ্ট হয় যে, কুরবানীর বিধান প্রত্যেক জাতির উপরেই অর্পিত হয়েছিল। শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উম্মাতের উপরেও এই বিধান আবশ্যিক তথা ওয়াজিব। কারো কারো মতে কুরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। কুরবানী সুন্নাত না ওয়াজিব এ নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও কুরবানী করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন এতে কারো দ্বিমত নেই। মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, কুরবানী কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ ও মুসলিমদের পালনীয় একটি 'ইবাদত।

কুরবানীর সংজ্ঞা

ফার্সি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত قُرْبَانِي শব্দটি আরবী قرب মূলধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ হচ্ছে নৈকট্য। তাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য শরিয়তসম্মত পন্থায় আদায়কৃত বান্দার যে কোনো 'আমলকে আভিধানিক দিক থেকে 'কুরবানী' বলা যেতে পারে। হোক সেটা যবেহকৃত বা অন্য কোনো দান-খয়রাত (ইমাম রাগিব)। তাফসীরে মাযহারীর বর্ণনা মতে, মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নযর-মান্নত রূপে যা পেশ করা হয় তাকে বলা হয় 'কুরবানী'। ইমাম আবূ বক্র জাস্সাস (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মহান আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য কৃত প্রত্যেক নেক 'আমলকে 'কুরবানী' বলা হয়। তবে প্রচলিত অর্থে এই উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করাকে বলা হয় কুরবানী। কুরবানীর সমর্থক শব্দ 'উযহিয়া, 'নাহর'।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক বছর কুরবানী দিতেন। এই কুরবানীর যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। 'ওয়াফাউল

[৫] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৭।*
[৬] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ২৭-২৮।*

ওয়াফা' ও 'কিতাবুল ফিকাহ্ আলাল্ মাযাহিবিল আরবাআ' নামক কিতাবদ্বয়ে রয়েছে রাসূল (ﷺ) ঈদের নামায আদায় করেন এবং এরপর কুরবানী করেন। ইবনুল আসীর লিখিত 'তারিখুল কামিল' গ্রন্থে দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়– রাসূল (ﷺ) 'বনী কায়নুকা' যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে কুরবানীর সময় উপস্থিত হয়। তাই তিনি ঈদগাহের দিকে গমন করেন এবং মুসলমানদের নিয়ে ঈদুল আযহার নামায আদায় করেন। আর এটিই ছিল মাদানী যুগের প্রথম কুরবানীর ঈদ। অতঃপর তিনি দু'টি ছাগল, অন্য বর্ণনা মতে একটি ছাগল কুরবানী করেন। আর এটিই ছিল তাঁর প্রথম কুরবানী। এরপর কোনো বছর তিনি কুরবানী থেকে বিরত থাকেননি। তিনি তাঁর কর্ম দ্বারা জাতিকে কুরবানী করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ১০ বছর মদীনায় অবস্থান করেছেন। মদীনায় অবস্থানকালীন প্রত্যেক বছরই তিনি কুরবানী করেছেন।[৭] যায়েদ ইবনু আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম একদিন নবীজি (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন– কুরবানী কি? তিনি (ﷺ) উত্তরে বললেন, এটি তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সুন্নাত (রীতিনীতি)। তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করা হলো এতে আমাদের জন্য কি রয়েছে? নবীজি (ﷺ) বললেন– কুরবানীর জন্তুর প্রতিটি লোমের পরিবর্তে একটি করে নেকী রয়েছে। এই হাদীস থেকে একথা বুঝা যায় যে, কুরবানী অনেক গুরুত্ব ও তাৎপর্যপুর্ণ একটি 'ইবাদত। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ ব্যয় করে, স্বার্থ ত্যাগ করে এই কুরবানী করতে হয়। কুরবানীর পর পরিবার ও দরিদ্রজনের মাঝে কুরবানীর পশুর গোশ্ত বণ্টন করা হয় এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য হাদিয়া ও উপঢৌকন পাঠানো হয়। কুরবানীর মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রকাশ ঘটে। কুরবানী দ্বীন ইসলামের নিদর্শন এবং প্রতীক। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন– কুরবানী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ এবং সমস্ত মুসলিম জাতির একটি 'আমল। সুতরাং কুরবানী কুরবানীই এর বিকল্প নেই। কেউ যদি কুরবানী না করে সমপরিমাণ সম্পদ সাদাক্বাহ্ করে তাতে তার কুরবানীর হক্ব আদায় হবে না। যদি তা বৈধ বা উত্তম হতো তাহলে নিশ্চয় তাঁরা (পূর্ববর্তীগণ) তার ব্যতিক্রম করতেন না।[৮]

[৭] *মুসনাদে আহমাদ; জামে' আত্ তিরমিযী।*
[৮] *ফাতাওয়ায়ে ইবনু তাইমিয়্যাহ্।*

কুরবানী কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত

শুধু কুরবানীই নয়; বরং প্রত্যেকটি 'ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত প্রধানত দু'টি। যথা-

(১) ইখলাস : কারো মনোরঞ্জন বা প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য নয় 'ইবাদতটি হবে স্রেফ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

"তুমি বলে দাও– আমার নামায, আমার সকল 'ইবাদত, (কুরবানী ও হজ্জ) আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্যে।"[৯]

মহান আল্লাহর ভয়ও থাকতে হবে তার সঙ্গে যাকে বলে তাক্বওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾

"আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশ্ত ও রক্ত; বরং তার কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া।"[১০]

(২) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণ ও অনুকরণে কুরবানী সংক্রান্ত শরিয়তের সকল নিয়ম-কানুন মেনে কুরবানী করতে হবে। তাহলেই কুরবানী কবুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আমাদের শিক্ষা

(১) আদাম (আলাইহিস সালাম)-এর সময়েও কুরবানীর প্রচলন ছিল যার কারণে কাবীল ও হাবীল কুরবানী করেছে।

(২) কাবীল কর্তৃক হাবীলকে হত্যার কাহিনীর মধ্যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় প্ররোচিত হওয়ার ও তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ক্ষমতার প্রমাণ নিহিত রয়েছে।

(৩) মুত্তাক্বী ব্যক্তিগণ কখনো অন্যায়ের পাল্টা অন্যায় করেন না; বরং মহান আল্লাহর উপর ভরসা করেন। মহান আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টকে মহান আল্লাহর পরীক্ষা মনে করেন এবং এতে ধৈর্য ধারণ করেন।

(৪) আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ বিনয়ী ও মার্জিত আচরণের অধিকারী হয়।

(৫) আল্লাহ তা'আলা কেবল মুত্তাক্বীদের কর্মগুলোই কবুল করেন। ❑

[৯] *সূরা আল আন'আম : ১৬২।*
[১০] *সূরা আল হাজ্জ : ৩৭।*

জান্নাতে বাড়ি যাদের জন্য বরাদ্দ

সংকলন ও ভাষান্তর : শাইখ মুহাম্মাদ ইব্রাহীম মুহাম্মাদ আব্দুল হালিম আল মাদানী (হাফিজাহুল্লা-হ)*

প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন–

(١) قال : من قرأ : "قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ" عشر مرات؛ بنى الله له بيتا في الجنة.

(১) "যে ব্যক্তি ১০ বার "قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ" তথা সূরা আল ইখলাস পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ করবেন।"[১১]

(٢) من سَدَّ فُرجةً؛ ورفعه الله بها درجةً بنى له بيتاً في الجنة.

(২) রাসূল (ﷺ) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি সালাতের সময় কাতারের মাঝের ফাঁকা পূরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিবেন এবং জান্নাতে তার জন্য বাড়ি নির্মাণ করবেন।"[১২]

(٣) قال : «مَنْ بنى لله مسجدًا، ولو كمفْحص قطاة أو أصغر، بنى الله له بيتا في الجنة».

(৩) রাসূল (ﷺ) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আর তা যদি কাতা' পাখির বাসার ন্যায় অথবা তার চেয়েও ক্ষুদ্রতর হয়, বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ করবেন।[১৩]

(٤) مَنْ صَلَّى الضُّحى أربعًا، وقبل الأولى أربعًا بني له بيت في الجنة». الأولى : صلاة الظهر.

(৪) রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি চাশতের সময় ৪ রাকআত এবং যোহরের পূর্বে ৪ রাকআত সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ করবেন।[১৪]

(٥) من عاد مريضًا، أو زار أخًا في الإسلام، ناداه مناد : أن طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلًا.

(৫) রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো অসুস্থকে দেখতে যায় অথবা দ্বীনি ভাইয়ের সাক্ষাতে যায়, তখন একজন ফেরেশ্তা ঘোষণা করতে থাকে, "তোমার দুনিয়া আখিরাতের জীবন পবিত্র হোক, তোমার এই চলা পবিত্র হোক"। আর জান্নাতে তার জন্য বাড়ি নির্মাণ করা হয়।[১৫]

---

* *বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*
[১১] *সহীহুল জামে' - হা. ৬৪৭২।*
[১২] *সহীহুত্ তারগীব- হা. ৫০৫।*
[১৩] *সহীহুল জামে' - হা. ৬১২৮।*
[১৪] *সহীহুল জামে' - হা. ৬৩৪০, হাসান।*
[১৫] *সহীহুল জামে' - হা. ৬৩৮৭, হাসান।*

প্রবন্ধ

নেপালে বাঙালি মুসলমানদের বসতি : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

নেপালে মুসলিম বসতির ইতিহাস সুবিদিত ঘটনা। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসেমের সিন্ধু বিজয়ের ঢেউ সমগ্র উপমহাদেশে আছড়ে পড়ে। ইসলাম প্রচার ব্যপদেশে তখন থেকে হিমালয় কন্যা নেপালে সুফি-সাধকদের আগমন ঘটেছে। ব্যবসায়িক কারণে পরবর্তীতে বহু মুসলমান নেপাল হয়ে তিব্বত গমনকালে ইসলাম প্রচার করেছেন।[১৬]

অন্যদিকে ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে চিনে ইসলাম প্রচার মুসলমানদের আগমন ঘটে। চিনের ক্যান্টনে মুহানবী (ﷺ)-এর মামা, সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাসের মাযার তার প্রমাণ বহন করে। উমাইয়া খিলাফতকালে (৬৬১-৭৫০) সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিম অক্সাস গিরিমালা অতিক্রম করে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল করায়ত্ব পূর্বক চিন পর্যন্ত অগ্রসর হন। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে চিনের অভ্যন্তরীণ অরাজকতা নিরসনের জন্য সম্রাট সু সাং 'আব্বাসীয় খলিফা (৭৫০-১২৫১) আল মানসুরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। খলিফা আবূ জাফর আল মানসুর চিনে ১টি সেনা ইউনিট প্রেরণ করেন। সফলতার সাথে সেনাদল বিদ্রোহীদের কবল হতে সিনগানফু ও হুনানফু শহর দু'টো পুনরুদ্ধারে সম্রাটকে সহায়তা করে।

এভাবে চিনে মুসলমানদের প্রবেশ ও বসতি বিস্তার লাভ করে। অর্থাৎ- চিনের পশ্চিমে উত্তরের তিব্বত হয়ে নেপালেও মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে বর্তমানে নেপালের মুসলমানেরা কাশ্মিরী, নেওয়ারী, গোর্খা, পশতুন ও বাঙালি বিভিন্ন পরিচয়ে বসবাস করছে। এই নিবন্ধে শুধুমাত্র বাঙালি মুসলমানদের নেপালে অভিবাসন প্রসঙ্গে যৎসামান্য আলোকপাত করা হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ নেপাল একটি সুপরিচিত নাম। অন্ততঃ হাজার বছর থেকে নেপালের সাথে বাংলা ও বাঙালির একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয়ে জানা যায়।[১৭] নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা হতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে চর্যাপদের প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার একটি অনন্য ঘটনা। চর্যাপদে বাংলা ও বাঙালির গভীর সম্পর্ক তুলে ধরে।[১৮] বাংলা ভাষার আদিরূপ যে চর্যাপদ সে বিষয়ে সাহিত্যিক আব্দুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান ও অতীন্দ্র মজুমদার লেখনীতে জানা যায়। বেশ ক্ষুদ্র আয়তনের দেশ নেপালের ভূমিরূপ অত্যন্ত বিচিত্র, মনোহরা। উত্তরে চিন ও দক্ষিণে ভারতের বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমের উত্তরাখণ্ড যেন দেশটিকে আগলে রেখেছে। এ জন্য অনেকে দেশটিকে ল্যান্ড লক্ড (Land Locked Country) নামে অভিহিত করে থাকে।

রাজনৈতিকভাবে নেপালের সাথে বাংলার সম্পৃক্ততার ইতিহাস বড়ই চমকপ্রদ। ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে হাজী ইলিয়াস শাহ ফিরূজাবাদের সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা করে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্য সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ নেপাল বিজয়ের জন্য উদ্যোগী হন। নেপালের মতো দুর্গম গিরিরাজ্য[১৯] আক্রমণের অভিলাষ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে রাজ্য সীমা বিস্তার ও বিপুল সম্পদের লাভের দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে নেপাল জয়ে প্ররোচিত করতে পারে। সম্ভবতঃ মধুবনী বা উত্তর দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলেই তিনি নেপালের বিপুল ঐশ্বর্যের কথা

---

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

[১৬] একটি নির্ভরযোগ্যসূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, তিব্বতগামী কাশ্মীর মুসলিম ব্যবসায়ীরা ১৫ শতকের শুরুতেই নতুন আঙ্গিকে নেপালে ইসলামের দাওয়াত দেন। রাজ্য রত্নমাল্লার যুগে তাদের অনেকেই কান্তিপুর (কাঠমণ্ডু), বাখতাপুর ও লালিতপুরে স্থায়ী হন। রাজপ্রাসাদ থেকে কয়েকশ গজ দূরে অবস্থিত কাশ্মিরী তাকিয়া মসজিদ পঁচিশ বছরের অতীতের যেন নির্বাক সাক্ষী। মসজিদের প্রাঙ্গনে শুয়ে আছেন বেগম হযরত মহল। তাঁর সমাধি একই সঙ্গে নিঃস্বতা ও অতীত মহিমার প্রতিচ্ছবি। বেগম হযরত মহল ছিলেন ভারতের অযোধ্যার রানী। তিনি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিপ্লব ব্যর্থ হলে তিনি লক্ষ্ণৌ থেকে অনুগামী সমভিব্যবহারে নেপালে আশ্রয় নেন। নেপালের তৎকালীন শাসক রাজা জংবাহাদুর রানা তাঁকে আশ্রয় দেন। ব্রিটিশ সরকারের পৌষ্য হিসেবে পরিচিত নেপালের রাজ পরিবারের এই সিদ্ধান্ত ছিল অভাবনীয়।

[১৭] বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ।

[১৮] চর্যাপদসমূহে তদানীন্তন বাংলার প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক বিবরণসহ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

[১৯] পৃথিবীর সর্বোচ্চ ১০টি পর্বতের ৮টিই নেপালে অবস্থিত। এখানেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট অবস্থিত।

শুনেছিলেন। কোন পথে যে বাংলার সৈন্য কাঠমান্ডুতে উপস্থিত হয়ে ছিলেন তার কোনো উল্লেখ নেই। নেপাল রাজবংশাবলীতে উল্লিখিত আছে, ৪৬৯ নেওয়ারী সম্বৎ বা ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দে নেপালের রাজা জয়রাজ মল্ল পশুপতি নামের কোষ থেকে অর্থ গ্রহণ করেন। তারপরে পূর্ব দেশের (বাংলার) সুরত্রান (সুলতান) সমসদীন (শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ) নেপালে এসে পশুপতি নাথকে তিনখণ্ড করেন এবং সমস্ত পুড়িয়ে দেন। কাঠমন্ডুর অদূরে স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের এক শিলালিপিতে ইলিয়াস শাহের নেপাল আক্রমণের তারিখ ৪৭০ নেওয়ারী সম্বৎ বা ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[২০]

সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ শিলিলিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

সপ্ততত্যভ্যধিকে শ্রীমন্নেপালাব্দ চতঃশতে।
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে দশম্যাং গুরুবাসরে ॥
সুরত্রান সমসদীনো বঙ্গাল বহুলৈ বলৈঃ।
সহাগত্য চ নেপালে ভগ্নো দগ্ধশ্চ সর্বশঃ ॥

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ৪৭০ নেওয়ারী সম্বৎ বা ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে শামস-উদ্দীন নেপাল আক্রমণ করে ছারখার করেছিলেন। প্রাচীন ললিতপুরী বা পাটনের লিপিতে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের নেপাল আক্রমণের কথা এভাবে বলা আছে–

শ্রুতান সমসদীন যবনা ধিরাজঃ
নেপাল সর্বনগরং ভস্মীকরোতি।

ঐতিহাসিক জয়সওয়াল বলেন, ইলিয়াস পশুপতিনাথ মন্দিরের ধনরত্নও লুণ্ঠন করেছিলেন।[২১] যাহোক, ইলিয়াস দীর্ঘকাল কাঠমন্ডুতে অবস্থান করেননি। সম্ভবতঃ পার্বত্য যুদ্ধের অনিশ্চিত ফলাফল সম্বন্ধে মুসলিম সৈন্যবাহিনী সন্দিহান হয়ে পড়েছিল। কিংবা কাঠমন্ডুর দুর্গম পার্বত্য উপত্যকায় সমতলের সেনাবাহিনীর রণকৌশল প্রদর্শনের কোনো সম্ভাবনা নেই বিবেচনা করে ইলিয়াস স্বল্পকালের মধ্যে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। অমিতচেতা ইলিয়াস কিন্তু নেপাল আক্রমণ করেছিলেন আকস্মিকভাবে; কতকটা সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন বলা যায়।

নেপাল জয়ের আগেই ইলিয়াস শাহ ত্রিহুতের (উত্তর বিহার অঞ্চল) বেশ কিছু অঞ্চল জয় করেছিলেন। ত্রিহুত এ সময়ে অন্তদ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল। সমগ্র রাজ্যটি দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার মধ্যে বিভক্ত হয়েছিল। হরিসিংহদেবের পৌত্র শক্তিসিংহ উত্তরাংশের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল শিমরাঁও। দক্ষিণাংশের অধিকারী ছিলেন কামেশ্বর; তিনি ছিলেন দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মনোনীত। তার রাজধানী ছিল দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলের মধুবনীতে। বস্তুতঃ এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর আত্মকলহের সুযোগে ইলিয়াস ত্রিহুতের বেশ কিছু অংশ জয় করে নেন। সে ধারাবাহিকতায় উৎসাহী সৈন্যরা নেপাল অবধি বাংলার স্বাধীন সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

সুলতান ও শাসকরা সরাসরি ধর্মপ্রচারে সংযুক্ত হতেন না; কিন্তু প্রচারক কিংবা ধর্মানুরাগীদের পৃষ্ঠপোষণা দান করতে কার্পণ্য করতেন না। বিজয়ীর বেশে তারা যেখানেই গেছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভাগ্যান্বষী যোদ্ধাও অনুসারী সহগমন করেছেন। গড়ে তুলেছেন সমমনাদের সমাহারে উপনিবেশ। সাতগাঁ, সোনারগাঁও ও লাখনৌতি একত্রীকরণ ইলিয়াস শাহের অবিস্মরণীয় কীর্তি। তিনি বাংলাদেশের তিন অঞ্চলের অধীশ্বর হন অর্থাৎ- তিনি সমগ্র বাংলাদেশের অধীশ্বর হন। তাঁর পূর্বে বাংলার আর কোনো মুসলমান সুলতান সমগ্র বাংলার সুলতান হবার গৌরব অর্জন করেননি। এ কারণেই তিনি শাহ-ই-বাঙ্গালী, শাহ-ই-বাঙ্গালীয়ান এবং সুলতান-ই-বাঙ্গালা উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।[২২] ইলিয়াস শাহের নেতৃত্বে নেপালী বিজয় ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

উত্তর বিহার অঞ্চলে মুসলমানদের বসতি স্থাপনে ইলিয়াস শাহের বিজয়ভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ক্রমশঃ নেপাল অবধি তার বিজয় সম্প্রসারিত হলে নেপাল অঞ্চলে মুসলমানদের বসতি বিস্তার অব্যাহত থাকে। বাঙালি মুসলমানদের নিকট আগ্রহের স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়। কালক্রমে উত্তর ভারত সংলগ্ন নেপাল অঞ্চলে মুসলমান বিশেষতঃ বাঙালি মুসলমানদের যাতায়াত শুরু হয়। নিরাপদ ও চমৎকার নৈসর্গিক পরিবেশে আপ্লুত আবেগপ্রবণ বাঙালি সমাজ বসতি স্থাপন শুরু করে।

স্বাধীন সালতানের পুরো সময়টা (১৩৩৮-১৫৩৮) জুড়ে অবিভক্ত বাংলায় মুসলমান ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। পরধর্মমত সহিষ্ণুতার রাখী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিশেষতঃ সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময় তা পূর্ণতা পায়। হোসেন শাহ নিষ্ঠাবান

[২০] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল*, পৃ. ২২।

[২১] Jayaswal, Kathmandi Inseriptions, *Journal of The Bihar and Orissa Research Society, Vol. XX11*, Calcutta, 1939।

[২২] Shams-i-Shiraj Afif, Tarikh-i-Firujshahi (ed.), Vilayet Husain, Calcutta 1980, PP 114-118.

মুসলমান হলেও হিন্দুদের প্রতি তিনি উদারনীতি পোষণ করতেন। তিনি বহু হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ দেন। রূপ ও সনাতন নামক দুই ভাই তার মন্ত্রী ছিলেন। রূপের উপাধি ছিল 'দবীর খাস' এবং সনাতনের উপাধি ছিল 'সাকর মল্লিক'। এদের বড় ভাই রঘুনন্দন এবং ছোট ভাই রাজ বল্লভ ও উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন।

বল্লভের উপাধি ছিল 'অনুপম মল্লিক'। রূপ সনাতনের ভগ্নিপতি শ্রী কান্তরাজ সরকারি চাকুরি করতেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ সকলের প্রতি সদয় ছিলেন। বৈষ্ণব ভাবনার পথিকৃত শ্রী চৈতন্য বাংলা অতিক্রমকালে সুলতান কর্তৃক সমাদৃত হন। শ্রী চৈতন্যকে প্রটোকল দেয়ার জন্য রূপ-সনাতন ভ্রাতৃদ্বয়কে রামকেলি গ্রামে প্রেরণ করেন। তার সুশাসনে সাম্রাজ্য ব্যাপী চরম শান্তি বিরাজ করছিল।[২৩]

আমাদের ধারণা, এ সময়কালেও বিহার সন্নিহিত নেপাল অঞ্চলে বাঙালি মুসলমানদের অভিবাসন অব্যাহত ছিল।

১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন সালতানাতের অবসানের পর মুঘলদের (১৫২৬-১৮৫৮) অনুপ্রবেশের ফলে বাংলা পুনর্বার দিল্লীর কর্তৃত্বাধীনে আসে। সুলতানী আমলের ভৌগলিক অখণ্ডতা মুঘল আমলেও অব্যাহত ছিল। উপরন্তু মুঘলদের উদারনীতি সমগ্র সাম্রাজ্যে একাকার হয়ে টিকে থাকার বার্তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

মুঘলদের রাষ্ট্র পরিচালনায় উদারনীতি বর্হিদেশীয় বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলোকে আকৃষ্ট করে। পরবর্তীতে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সমগ্র উপমহাদেশের 'বণিকের দণ্ড রাজদণ্ডে' পরিণত হয়। 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির আওতায় ইংরেজরা সফলভাবে প্রজা শাসনে সক্ষম হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলায় ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি হয়। রবার্ট ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থায় নবাবের দায়িত্ব ছিল; কিন্তু কোনো ক্ষমতা ছিল না। অর্থের জন্য তাঁদের কোম্পানীর দয়ার উপর নির্ভর করতে হতো। যার ফলে অর্থের অভাবে প্রয়োজনের সময় নবাব কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারতেন না। তাঁরা ছিলেন ইংরেজদের আজ্ঞাবহ। ফলে জনসাধারণের নিকট তাদের কোনো গুরুত্ব ছিল না। এতে দেশে চরম শাসন-বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ কোম্পানির অস্বাভাবিক মুনাফা প্রসূত রাজস্বনীতি এবং এর ফটকাবাজ দালালদের অর্থ লালসা ও অন্যায়মূলক কার্যকলাপ বাংলার দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষের উদ্রেক করে। তৃতীয়তঃ বাংলা ১১৭৬ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ফলে প্রজাসাধারনের দুরাবস্থা অত্যন্ত চরমে পৌঁছে। দেশে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ও অন্যান্য অপরাধের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। চতূর্থতঃ পরবর্তীতে নবাবের সৈন্য বাহিনী ভেঙ্গে দেয়ার ফলে বহুলোক বেকার হয়ে পড়ে এবং কর্মস্থানের ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় অনেকেই চুরি ডাকাতি করে জীবিকা নির্বাহের পথ বেছে নেয়। গ্রাম বাংলার শান্ত সমাজে অস্থিরতা দেখা দেয়। পরিবার পরিজন নিয়ে শান্তিতে বেঁচে থাকার তাগিদে নিজ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র বসতি স্থাপন করে।

বাংলার গ্রামীণ সমাজ জীবনে অস্থিরতার অন্যতম কারণ ছিল ইংরেজ মুনাফাখোর বেনিয়াদের বাণিজ্যিক নীতি ও নীল চাষ। ১৭৭৭ সালে বাংলায় প্রথম নীলচাষ শুরু হয় এবং লুইস বোনার্ডকে প্রথম নীলকর মনে করা হয়। উনিশ শতকের প্রথমভাগে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে সেখানকার বস্ত্র শিল্পে নীলের চাহিদা দেখা দেয়।

উর্বরা বাংলায় ব্রিটিশ ক্ষমতা সম্প্রসারণের সাথে সাথে নীলচাষের ক্ষেত্র মুর্শিদাবাদ ও মালদহ এলাকায় বিস্তার লাভ করে। নীলকররা কৃষকদের উৎকৃষ্ট জমিতে নীল বুনতে বাধ্য করত। নীল ছাড়া অন্য কোনো শস্য উৎপাদন করতে দিত না। দাদনের টাকা দেয়ার সময় শর্ত সাপেক্ষে চুক্তি পত্রে টিপসই দিতে হত। চুক্তি অনুযায়ী কাজ না করলে চাষীর উপর চালানো হত অকথ্য অত্যাচার। ১৮৩০ সালে সরকার পঞ্চম আইন জারি করে। আইনের বলে নীলকররা আরো শক্তিশালী ও বেপরওয়া হয়ে উঠে। নীল চাষ না করতে চাইলে কৃষকের উপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালানো হতো। অত্যাচারের ভয়ে ভীত বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলে রেহাই হত না– তাদের ভিটেমাটিতে নীল চাষ করা হত। কারো কারো বাড়ি ঘরে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হত। প্রতিটি নীলকুঠিতে ছিল কয়েদখানা। সেখানে তাদের বন্দী করে চলতো নিদারুণ অত্যাচার। এমনি একটা অবর্ণনীয় অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ দেশান্তর হয় এবং এদের অধিকাংশই নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ব্রিটিশদের নিপীড়নে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলা উর্বরাভূমি অধুনা চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চল। পদ্মা, মহানন্দী পাগলা বিধৌত এ অঞ্চলে ফি বছর বন্যায় প্লাবিত হত। বন্যা অপসারণের পর প্রচুর পলি জমে জমিকে উর্বর করে তুলতো। এতে ইংরেজদের দৃষ্টি নিপতিত হয়। নীলচাষে ছাড়া খাজনা

[২৩] হোসেন শাহী 'আমলে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ধর্মেরও এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম ও শৈবধর্ম ছাড়াও এ যুগে বহু আঞ্চলিক ধর্মীয় মত ও সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা দেখা যায়। পুরা সালতানাতে সৌহার্দ্যপূর্ণ আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক সহবস্থানের চমৎকার ধারা গড়ে উঠে।

আদায়ে বর্বরতার দরুণ মানুষ অতীষ্ট হয়ে উঠে। জলমহল ইজারা নিয়ে গ্রাম্য মোড়ল মাতব্বরদের সাথে ইংরেজ-পাইক-বরকন্দাজদের সাথে সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। কারণ, হিসেবে গরমিল, সই জালকরণ, ঘুষ ও সুদ নিয়ে গ্রামকে সর্বশ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। এমনিভাবে গোমস্তা, মুৎসুদ্দি, মেঠো আমিন, সদর আমিন, সরকার-তহসিলদার, মাহুত, সহিস, বরকন্দাজ, ওজনদার, পেয়াদা-জামাদার, তাগিদগীর, চৌকিদার প্রভৃতি কর্মচারীরা হরহামেসা অত্যাচার-নির্যাতন বাংলার পরিবেশকে দুঃসহনীয় করে তুলেছিল। নৃতাত্ত্বিকভাবে অবিভক্ত মালদহ মুর্শিদাবাদের মানুষ স্বাধীনচেতা ও সাহসী ছিলেন। কখনো কখনো তারা ইংরেজদের পাইক বরকন্দাজদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রতিহত করতেন। নিজেদের মর্যাদা রক্ষার জন্য তারা সপরিবারে দেশান্তর হতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

এঁদের অধিকাংশ পরিবার নেপালে বসতি স্থাপন করে। একটি সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, বিহার রাজ্যের আরারিয়া, মধুবানী, সীতাসার মতিহারী ও যোগবানী প্রভৃতি স্থান সংলগ্ন পূর্ব পশ্চিম নেপালে প্রচুর সংখ্যক বাঙালি মুসলমান অভিবাসিত হয়। বিশেষতঃ মধুবানী সংলগ্ন নেপালে উর্দুভাষী ও আরারিয়া সংলগ্ন যোগবাণীতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে অভিবাসিত প্রচুর সংখ্যক বাঙালি মুসলমানের বসতি স্থাপনের তথ্য আমাদের চমৎকৃত করে। ছিয়াত্তরের মনন্তর বাঙালিদের মধ্যে ভীতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। তারা ভিটেমাটি ছেড়ে বাংলার পশ্চিম সংলগ্ন মালদা ও বিহার অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এমশঃ মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলা, বিহারের কাটিহার, পূনিয়া, আরারিয়া ও ফরবেশগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এ সকল অঞ্চল নেপাল সংলগ্ন হওয়ায় কালক্রমে এরা পরিবার নেপাল চলে যায়। অধিকতর শান্ত ও প্রাকৃতিকভাবে বসবাস উপযোগী তরাই[২৪] অঞ্চলে বাঙালি মুসলমানদের যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ভাগান্বেষী এ সকল মানুষকে নিয়ে প্রবাদ রচিত হয়–

'পালিয়ে গেলে নেপাল,
সঙ্গে যাবে কপাল।'

চর্যাপদের যুগ থেকে নেপালের সাথে বাংলা ও বাঙালিদের নাড়ির যোগসূত্র লক্ষ্য করি। সেই হাজার বছরের পরিক্রমার আজও সে সম্পর্ক অটুট আছে। ইলিয়াস শাহের 'আমলে সূচিত নেপালে মুসলমানদের বসতি স্থাপন আজ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫% উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে নেপালে চারটি পৃথক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দু অধ্যুষিত নেপালী সমাজকে আলোকিত করে চলেছে। এরা হলো চৌরাতি, মাধেসী, কাশ্মিরী এবং তিব্বতি মুসলমান।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করলে নেপালের তরাই বহু বাঙ্গালি অঞ্চল মুসলমানদের আগমন ঘটে। বলা বাহুল্য চতুর্দশ শতক হতে বিহার ও ত্রিহুত সন্নিহিত এতদঅঞ্চলে মুসলমানদের বসতি ছিল। সেখানে বিতাড়িত মুসলমানদের স্বাগত জানানো হয় এবং ক্রমশঃ বিভিন্ন উপলক্ষে মুসলমানদের অভিবাসন অব্যাহত থাকে।

নেপালের তরাই অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানরা মাধেসি নামে পরিচিত। নেপালে বসবাসকারী মুসলিম জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশ মাধেসি সম্প্রদায়ভূক্ত। আমাদের ধারণা, ঊনবিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এতদঞ্চলে এদের ব্যাপক আগমন ঘটে। বিশেষতঃ বৃহত্তর রাজশাহী, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ থেকে এরা অভিবাসিত হন। আত্ম পরিচয়ের সংকটে নিপতিত হয়ে স্থানীয় দ্বারা মাধেসি নামে অভিহিত হয়।[২৫] তরাই অঞ্চলটির প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উর্বরা বৈশিষ্ট্য এদের আকৃষ্ট করে। অঞ্চলটি হিমালয়ের পাদদেশে পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত একটি সমতল ভূমি। এটি বাঁকে জেলায় অবস্থিত। বাঁকে জেলার কপিলাবস্তু, কপানদেহি, পারসা, বাড়া, বৌহাটি, সিরাহা, সুনসারি, পশ্চিম তরাই এবং সাপ্তারি প্রভৃতি অঞ্চলে এসে বসবাস করে। তারাই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষিকার্য শুরু করে। ক্রমশ কৃষি অর্থনীতিতে উন্নতি করায় স্থানীয় নেপালীদের আনুকূল্য লাভ করে। কৃষি কার্যের প্রয়োজনে নানা অঞ্চল থেকে ব্যাপকহারে মুসলমান শ্রমিকদের সমাগম ঘটে। এদের অধিকাংশই চাঁপাই নবাবগঞ্জ বংশোদ্ভূত মুসলমান।

প্রতিষ্ঠানিকভাবে মাতৃভাষা চর্চার ব্যবস্থা না থাকায় এদের অধিকাংশ আওয়াধী, ভোজপুরি ও মৈথলী ভাষায় কথা বলে। তবে নিজেদের মধ্যে ও বাড়িতে বাংলা কথ্যভাষায় কথা বলে।

নেপাল ঐতিহাসিকভাবে ঘোষিত হিন্দু রাষ্ট্র। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে নেপালের সংবিধানে নেপালকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষনা দেয়া হয়। সাংবিধানে একজন হিন্দু রাজার

[২৪] তরাই (Tarai) হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত জলাভূমি, তৃণভূমি, তৃণভূমি, সাভানা ও অরণ্যময় বলয় অঞ্চল। এটি হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণে এবং গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তরে অবস্থিত। অঞ্চলটি পশ্চিমে যমুনা নদী ধরে ভারতের হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড থেকে পূর্বে উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত।

[২৫] এই মুসলিম সম্প্রদায় সমগ্র পশ্চিম বাংলা, বিহার ও দক্ষিণ নেপালে বসবাস করছে। ভারতে এরা শেরশাহবাদিয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত। ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের সময় বেশ কিছু সংখ্যক শেরশাহবাদিয়া, ভারত থেকে সম্পদ বদল করে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পাড়ি জমায়। কঠিন পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু শক্তিশালী সাহসী জাতি হিসেবে এদের সুখ্যাতি আছে।

অধীনে নেপাল শাসিত হয়ে মর্মে স্বীকৃতি প্রদান করে। নেপালে জাতীয় পরিষদে পাঁচজন মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে। এতে রাজনৈতিক শক্তিমত্তা অর্জনের পাশাপাশি সংবিধানিক মর্যাদা নিয়ে টিকে থাকার সুযোগ অবারিত হয়। প্রাচূর্য ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে নেপালি মুসলমানরা পিছিয়ে থাকলেও তারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেন।

নেপালে মুসলমানদের শিক্ষার পরিবেশ কম। সীমিত পরিসরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ বিদ্যমান। উচ্চশিক্ষার হার কম। তবে মুসলমানদের মাঝে ঐতিহ্যিকভাবে প্রচুর সংখ্যক ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমান শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণ সামান্যই বলা যায়। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৪১ সালে কাঠমান্ডুতে নিম্নমাধ্যমিক ইসলামী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সানসারী জেলায় আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া নামে একটি আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপালে মুসলমানগণ কতৃক প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আল মারকাযুল ইসলামী, কাঠমন্ডু, খুরখা মাদ্‌রাসা, মাজহারুল উলুম, মদীনা মসজিদ মাদ্‌রাসা, ঘাটিয়াল, কাঠমন্ডু জুমু'আহ্ মসজিদ। বর্তমানে নেপালে বেশকিছু মাদ্‌রাসা ৪৩০টি মসজিদ রয়েছে।

নেপাল হিন্দু রাষ্ট্র। জনসংখ্যার অধিকাংশ হিন্দু হওয়ার কারণে হিন্দু ধর্মমতের প্রভাব বেশি। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা এবং ধর্মীয়জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতিতে হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান। পরিবেশগত কারণে অমুসলিম রীতিনীতির বিদ্যমানতা চোখে পড়ার মতো। ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাহ্যিক চলাফেরা, আচার-আচরণে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিবাহ-শাদীতে হিন্দুয়ানী রীতির প্রচলন ঘটেছে। নিকট সম্পর্কের ব্যক্তির মৃত্যুতে মাথা নেড়া করা, চল্লিশা পালন মুসলমানদের নিত্য সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। মৃত ব্যক্তির দাফনে বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে প্রদর্শিত বিধানের ব্যত্যয় লক্ষণীয়। কারবালা দিবসে তাজিয়া বের করা, হায় হোসেন মাতম, জিঞ্জির দিয়ে বক্তঝরা প্রভৃতি নিষ্ঠুরতম বিধান চালু রয়েছে।

নেপালে মুসলমানদের মধ্যে পেশাগত জাতিভেদের পাশাপাশি সৈয়দ, শেখ, মুঘল, পাঠান প্রভৃতি বংশীয় মর্যাদার বিভাজন দেখতে পাই। পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায়, মির্জা ও ফকিরি বংশের প্রভাব দেখা যায়। পীর-মুরিদীর প্রচলন ইসলামের তাওহীদি ভাবনার বিপরীতে গড়ে উঠা জঞ্জাল নেপালে দৃশ্যমান। তবে অধুনা, বিশ্বব্যাপী সালাফদের তৎপরতার ফলশ্রুতিতে তৌহিদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নেপালী মুসলমানরা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে। শির্ক ও বিদআতের বিরুদ্ধে জমঈয়তে আহলে হাদীস, নেপালের তৎপরতা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দিকে নেপালী মুসলমানদের আকৃষ্ট করে চলেছে।

নেপালী মুসলমানগণ মর্যাদার সাথে টিকে থাকার তাগিদে গড়ে তুলেছে ইসলাম সংঘ, নেপাল, দ্য নিউ মুসলিম ন্যাশনাল, মুসলিম খ্রিষ্টগণ অ্যালায়েন্স, দ্য ন্যাশনাল মুসলিম ওমেন্স কাউন্সিল। ইসলাম সংঘ নেপাল মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সংগঠন। সংগঠনটির মধ্য দিয়ে মুসলমানগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, মসজিদ মাদ্‌রাসা নির্মাণসহ বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে আসছে। ইসলাম বিষয়ক পুস্তক রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশ করে সংঘ্যালঘু মুসলিম সমাজে প্রকৃত কল্যাণ সাধন করে চলেছে। এছাড়া ধনাঢ্য মুসলমানদের সহযোগিতায় কিছু সংখ্যক সাহায্য ও সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে আল ফালাহ দাতব্য সংস্থা, কপিলাবস্তু, ইসলামী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, জানাকপুর, মিল্লাত ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, সানসার ও মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন কাঠমান্ডু। নেপালে মুসলমানরা নানা শ্রেণিতে বিন্যাসিত হলেও স্বদেশকে বড় ভালোবাসে। নেপালীদের মতো শান্তি প্রিয় জাতি হিসেবে মুসলমানরাও খ্যাত অর্জন করেছে। তারা নিজেদের নেপালি হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে।

সার্কভুক্ত দেশ হওয়ায় বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। বাংলা একাডেমির সাথে Memorandum of Understanding Between Bangla Academy, Bangladesh and Nepal Academy কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত 2nd China-South Asia Literature Forum Trans Himalayan Litarary and Cultural Connectiities শীর্ষক কর্মশালা পরস্পরের সাথে সাংস্কৃতিক নৈকট অর্জনে সহায়তা করছে। সম্প্রতি ইউনেস্কোর আনুকূল্যে ইতিহাস বিষয়ক সেমিনার ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা ও বাঙালীর দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যিক সম্পর্কের শেকড়ে বারি সিঞ্চন নেপাল বাংলাদেশ সম্পর্কে আরো জোরদার করবে। অচিরেই পৃথক জাতিসত্বার আত্মপরিচয়ে নেপালে বাঙালি মুসলমানেরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। ❑

কুরবানীর পশু জবেহর সঠিক পদ্ধতি ও উত্তম সময়

–আবু মুহান্নাদ*

ইসলাম দয়া ও মমতার ধর্ম। যে কারণে ইসলামে পশুর প্রতিও দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন- হাদীসে এসেছে– সাহাবী শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ».

"আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বিষয়ে সুন্দর ও দয়া সুলভ আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, তোমরা যখন হত্যা করবে তখন সুন্দরভাবে করবে আর যখন জবেহ করবে তখনও তা সুন্দর ভাবে করবে। তোমাদের কেউ (জবেহ করতে চাইলে) যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং যবেহ্-এর পশুটিকে প্রশান্তি দেয়।"[২৬]

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি একটি ছাগল যবেহ্ করার জন্য মাটিতে শুইয়ে ছুরি ধার করতে লাগল। তখন প্রিয়নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ধমক দিয়ে বললেন,

أَتُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ هَلَا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا.

"তুমি কি একে কয়েকবার মৃত্যু দিতে চাও? তাকে মাটিতে শোয়ানোর আগে কেন তোমার ছুরি ধার দিলে না!"[২৭]

◈ পশু জবেহ করার সঠিক পদ্ধতি :

১. আল্লামা 'আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "(গরু, ছাগল, দুম্বা ইত্যাদি পশু) জবেহ করার সময় ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে পশুর খাদ্যনালী, শ্বাসনালী এবং গলদেশের দু পার্শ্বস্থ দু'টি মোটা রগ কর্তন করা উত্তম। তবে যদি কেবল খাদ্য ও শ্বাসনালী এবং এক পাশের একটা মোটা রগ কাটা হয় তাহলেও যথেষ্ট। এমনকি শুধু খাদ্য ও শ্বাসনালী কাটা হলেও যথেষ্ট। তবে উক্ত চারটা রগ কর্তন করা অধিক উত্তম।"[২৮]

ধারালো অস্ত্র দ্বারা এভাবে কর্তন করার পর পশুকে কিছুক্ষণ ধরে রাখলেই ভেতর থেকে রক্তগুলো বের হয়ে দ্রুতই নিস্তেজ হয়ে যাবে এবং প্রাণ ত্যাগ করবে।

২. প্রাণ ত্যাগ করার পূর্বে পশুর অন্য কোনো অঙ্গ কেটে কষ্ট দেয়া হারাম। যেমন- ঘাড় মটকানো, পায়ের রগ কাটা, চামড়া ছাড়ানো ইত্যাদি।

৩. অনুরূপভাবে, দেহ আড়ষ্ট হয়ে এলে চামড়া ছাড়াতে শুরু করার পর যদি পুনরায় লাফিয়ে ওঠে, তাহলে প্রাণ ত্যাগ করার কাল পর্যন্ত আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। যেহেতু পশুকে কষ্ট দেয়া আদৌ বৈধ নয়।

৪. পশু পালিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলেও ঘাড় মটকানো যাবে না; বরং তার বদলে কিছুক্ষণ ধরে রাখা অথবা হাঁস-মুরগীকে ঝুড়ি ইত্যাদি দিয়ে চেপে রাখা যায়।

৫. জবেহ করার সময় পশুর মাথা যাতে বিচ্ছিন্ন না হয় তার খেয়াল করা উচিত। কিন্তু যদি অসতর্কতা বশতঃ মাথা কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলেও হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে আল্লাহর নামে ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে প্রথমে বর্ণিত পদ্ধতির আলোকে জবেহ করার পর প্রাণ ত্যাগের পূর্বে যদি পশুর শরীরের কোথাও ছুরি ঢুকানো হয়, ছুরি দ্বারা গুঁতা দেয়া হয় বা আঘাত করা হয় তাহলে তাতে পশুটি হারাম হবে না। কিন্তু এভাবে করলে পশুটিকে কষ্ট দেয়ার কারণে গুনাহ হবে। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করুন –আমীন।

৬. পশুকে শুইয়ে জবেহকারী কেবলামুখী হয়ে এবং পশুর মাথাটা কেবলার দিকে একটু ঘুরিয়ে জবেহ করা উত্তম। তবে আবশ্যক নয়। অর্থাৎ- কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে আল্লাহর নামে যবেহ করলেও তা হালাল হবে।[২৯]

৭. আল্লাহর নামে জবেহ করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾

"(জবেহ করার সময়) যে পশুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় না, তোমরা তা ভক্ষণ করো না।"[৩০]

৮. জবেহ করার সময় "বিস্‌মিল্লা-হ, আল্লাহু আকবার" বলে পশুর কাঁধের পার্শ্বে পা দ্বারা চেপে ধরে ধারালো অস্ত্র দ্বারা শক্তি দিয়ে গলায় ছুরি চালাবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : «ضَحَّى النَّبِيُّ (ﷺ) بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».

---

* *সৌদি আরব প্রবাসী।*
[২৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৫৫।*
[২৭] *মুস্তাদরাকে হাকিম- হা. ৭৫৬৩।*
[২৮] *শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)।*
[২৯] *আল্লামা বিন বায. (রাহিমাহুল্লাহ)।*
[৩০] *সূরা আল আন'আম : ২১।*

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নিজ হাতে দু'টি সাদা-কালো বর্ণের দুম্বা কুরবানী করেছেন। (জবেহ করার সময়) তিনি 'বিস্‌মিল্লা-হ ও আল্লাহু আকবার' বলেছেন এবং পা দিয়ে সেগুলোর কাঁধের পার্শ্বদেশ চেপে রাখেন।[৩১]

সহীহুল বুখারীতে 'সাদা-কালো' শব্দের পূর্বে 'শিং ওয়ালা' কথাটি উল্লেখ আছে।

উল্লেখ্য যে, কোনো মুসলিম জবেহ করার সময় অসাবধানতা বশতঃ মুখে বিস্‌মিল্লা-হ-আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করতে ভুলে গেলে উক্ত জবেহকৃত প্রাণী হারাম হবে না। কেননা, মুসলিমের অন্তরে মহান আল্লাহর নাম রয়েছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে তা পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। আল্লাহু আ'লাম।

কুরবানী করার উত্তম সময় কোনটি?

ইসলামে যে কোনো ভালো কাজ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾

"অতএব তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করো।"[৩২]

রাসূল (ﷺ) বলেন,

«بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ».

"তোমরা আগেভাগে নেকির কাজ সম্পন্ন করো।"[৩৩]

সুতরাং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কুরবানী করা উচিত। বিনা কারণে বিলম্ব করা ঠিক নয়।

কুরবানী করার সর্বমোট সময় কয় দিন এবং উত্তম সময় কোনটি?

যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে ঈদুল আযহার সালাত আদায়ের পর থেকে শুরু করে ১৩ তারিখের সূর্য ডোবা পর্যন্ত মোট চার দিন (রাত-দিন) যে কোনো সময় কুরবানী করা জায়িয। তবে সর্বোত্তম সময় হলো, ঈদের সালাত শেষ করার পরই কুরবানী করা। সালাতের আগে পশু জবেহ করলে কুরবানী সহীহ হবে না। বারা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেছেন,

«إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِيْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ».

"ঈদের দিন আমরা প্রথমে সালাত আদায় করব। অতঃপর ফিরে এসে কুরবানী করব। যে ব্যক্তি এভাবে আদায় করবে সে আমাদের নিয়ম মতো করল। আর যে সালাতের আগেই পশু জবেহ্ করল সেটা তার পরিবারের জন্য গোশত হবে; এটা কুরবানী হবে না।"[৩৪]

তাই সালাত শেষ করার পরপর কুরবানী করার চেষ্টা করতে হবে। (খুতবাহ্ শেষ করার পর কুরবানী করা আরও অধিক উত্তম)

এতে কুরবানী দাতার জন্য আরেকটি সুন্নত পালন করা সম্ভব হয়। তা হলো– ঈদের দিন কোনো কিছু না খেয়ে ঈদের সালাত পড়া। তারপর ফিরে এসে সর্বপ্রথম কুরবানীর গোশ্‌ত খাওয়া। বেশি বিলম্ব করলে বা পরের দিন কুরবানী করলে এ সুন্নতটি আদায় করা হয়ত সম্ভব হবে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) لَا يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَأْكُلَ وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتّٰى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ.

"নবী (ﷺ) ঈদুল ফিতরের জন্য না খেয়ে বের হতেন না। আর ঈদুল আযহায় সালাত থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত কিছু খেতেন না। এরপর তিনি তাঁর কুরবানী থেকে খেতেন।"[৩৫]

উল্লেখ্য যে, ঈদের সালাত থেকে ফিরে এসে তিনি সর্বপ্রথম কুরবানীর 'কলিজা' খেতেন মর্মে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়।

বিনা কারণে বিলম্ব করা এ কারণেও ঠিক নয় যে, এতে কুরবানীর পশুর মৃত্যু, চুরি হওয়া, হারিয়ে যাওয়া বা অন্য কোনো দুর্ঘটনা ও বিপদাপদে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তখন হয়ত কুরবানী দেয়াই সম্ভব হবে না। তাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মহান আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে হবে।

শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "কুরবানী করা অধিক উত্তম ঈদের দিন, তারপর ২য় দিন, তারপর ৩য় দিন, তারপর ৪র্থ দিন।"[৩৬] আল্লাহু আ'লম। ❑

---

[৩১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫৬৫; সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৬৬।*

[৩২] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৪।*

[৩৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৮৬/১১৮, ১২৮/২৯৪৭, ১২৯/২৯৪৭।*

[৩৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫৪৫; সহীহ মুসলিম- ২/১৫৪।*

[৩৫] *মুসনাদে আহমাদ- মা. শা., হা. ২২৯৮৪; সুনানে দারাকুত্বনী- ১/৪৫, হা. ১৭১৫; হাদীসটিকে শু'আইব আরনাবুত হাসান বলেছেন; তাখরিজুল মুসনাদ- হা. ২২৯৮৪, অনুরূপভাবে ইমাম নববীও হাসান বলেছেন; আল মাজমূ'- ৫/৫।*

[৩৬] *শাইখের অফিসিয়াল ওয়েব সাইট।*

ইসলামের পঞ্চম খলীফার হাদীস সংগ্রহ অভিযান

–অধ্যাপিকা হাফিজা লোকমান

[১ম পর্ব]

ভূমিকা : ইসলামের পরিভাষায় মহানবী (ﷺ)-এর ওফাতের পর ইসলামী সাম্রাজ্যে যিনি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন তিনিই খলীফা।[৩৭] এই খলীফাদের ১ম চারজন আবূ বক্র, ‘উমার, ‘উসমান এবং ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু) ইসলামের ইতিহাসে ন্যায়পরায়ণ খলীফা হিসেবে স্বীকৃত। তাঁদের পরে হালাকু খানের দ্বারা বাগদাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত (৪১-৩৯৪ হি.) প্রায় ৩৫৩ বছরে ৫১ জন খলীফা ইসলামী সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন।[৩৮] তন্মধ্যে উমাইয়াহ্ ৮ম খলীফা হিলেন ‘উমার ইবনু আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হি.)। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাসহ শান্তির্পূণভাবে প্রজাপালনের জন্য সকল খলীফার মধ্যে একমাত্র তাঁর খেলাফতই ঐ ১ম চারজনের খেলাফতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তাই ইতিহাস তাঁকে ইসলামের পঞ্চম খলীফা (ন্যায়পরায়ণ) হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছে।[৩৯] আমরা তাঁকে ঘিরেই এখানে আলোচনা করার ইচ্ছা করেছি।

ইসলামী শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে হাদীস। হাদীস বলতে মহানবী (ﷺ)-এর কথা কাজ ও অনুমোদনকেই বুঝানো হয়।[৪০] বিশেষ করে আল কুরআনকে বুঝার ক্ষেত্রে হাদীস হচ্ছে একমাত্র এবং নির্ভেজাল মাধ্যম। হাদীস একাধারে পবিত্র কুরআনের যেমন নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে তেমন মহানবী (ﷺ)-এর পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি, আদর্শ এবং তাঁর কথা, কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণও দান করে। সুতরাং হাদীস ছাড়া একজন মুসলিমের কোনো গত্যন্তর নেই।

মহানবী (ﷺ)-এর জীবদ্দশাতেই সম্পূর্ণ কুরআন সংকলিত হয়েছিল।[৪১] কিন্তু বিভিন্ন কারণে হাদীস সংকলিত হয়নি। এমনকি পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরেও তা নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগৃহীত এবং সংকলিত হয়নি। ফলে আল কুরআন-এর নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধতম অর্থ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানা এবং যে কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধান করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এহেন বাস্তব সমস্যার একটি নিষ্পত্তিমূলক সমাধানকল্পে ইসলামের ৫ম খলীফা হাদীস সংগ্রহ অভিযান, পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, কি কি প্রয়োজনকে সামনে রেখে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল এবং তিনি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বক্ষমান প্রবন্ধে সে বিষয়ের উপরই কিছু আলোচনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে মাত্র।

হাদীস পরিচিতি : অভিধানে হাদীস-এর উল্লেখযোগ্য অর্থ করা হয়েছে অভিনব বাণী বা বস্তু।[৪২] রাসূল (ﷺ) শরিয়ত বিষয়ে নবাবিষ্কৃত মত ও পথকে মুহদাসাহ (অভিনব হাদীস) অর্থাৎ- বিদআত নামে অভিহিত করেছেন।[৪৩] তবে সংবাদ বা বাণী অর্থে হাদীস এর ব্যবহার সমাধিক। আর এ জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, মহান আল্লাহর বাণী এবং মহানবী (ﷺ)-এর বাণীকে হাদীস বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআন নিজেই নিজেকে একাধিকবার হাদীস নামে উল্লেখ করেছে।[৪৪] এমনিভাবে মহানবী (ﷺ)-ও তাকে হাদীস নামে অভিহিত করেছেন।[৪৫] তাছাড়া তিনি নিজের বাণীকে ও হাদীস নামে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৬]

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় হাদীস বলতে বুঝায় মহানবী (ﷺ)-এর বাণী, কর্ম, অনুমোদন এবং তাঁর

---

[৩৭] *তারীখুল খুলাফা- জালালুদ্দীন সূয়ূতী, দিল্লী : আসাহহুল মাতাবি', তা. বি., ভূমিকা দ্র.।*

[৩৮] *প্রাগুক্ত, 'উমাইয়াহ্ এবং 'আব্বাসী যুগ দ্র.।*

[৩৯] *প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২; আল খালীফাতুয যাহিদ : আব্দুল আযীয সাইয়্যিদুল আহল (বৈরুত : দারুল ইলম লিলমালাঈন ৭ম সংস্করণ, ১৯৭৩ খৃ.) পৃ. ৯৮-৯৭ এবং ১২৩, ১৫৯, ১৯৭।*

[৪০] *তাদরীবুর রাভী- জালালুদ্দীন সুয়ূতী : সম্পাদনা : আব্দুল ওয়াহাব (মদীনা : আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, ১৯৫৯ খ্রি.) পৃ. ৬; আল মুখতাসারুল ওয়াজীয- ড. উজাজ আল খত্বীব (বৈরুত : মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৬, ১৯।*

[৪১] *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন- মান্নাউল কাত্তান (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৩ খ্রি.) পৃ. ১১৮-১২৩।*

[৪২] *মু'জামু মিকইয়াসিল লুগাহ- ইবনু ফারিসা সম্পাদনা : আ. সালাম মুহা. হারুন (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খ্রি.), খণ্ড- ২, পৃ. ৩১।*

[৪৩] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- শাইখ ওয়ালিউদ্দীন (বৈরুত : আল মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.) খণ্ড : ১, পৃ. ৫১।*

[৪৪] *দেখুন, সূরা আন্ নিসা : ৭৮, ৮৭; সূরা আল আ'রাফ : ১৮৫; সূরা আল কাহ্ফ : ৬, সূরা আয্ যুমার : ২৩; সূরা আত্ ত্বূর : ৩৪; সূরা আন্ নাজ্ম : ৫৯; সূরা আল ওয়া-ক্বি'আহ্ : ৮১; সূরা আল ক্বলম : ৪৪; সূরা আল মুরসালা-ত : ৫০।*

[৪৫] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- খণ্ড : ১, পৃ. ৫১।*

[৪৬] *সহীহুল বুখারী- মুহাম্মদ ইবনু ইসমা'ঈল বুখারী (মীরাট : হাশেমী প্রেস, ১৩২৮ হি.), খণ্ড : ২, পৃ. ৯৭২।*

গুণ-বৈশিষ্ট্যকে।[৪৭] কুরআন-এর মতো হাদীসও এক প্রকার ওয়াহী। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "নক্ষত্রের কসম, যখন তা অস্তমিত হয়। তোমাদের সাথী [মুহাম্মদ (ﷺ)] পথ ভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। তাতো ওয়াহী যা প্রত্যাদেশ হয়"[৪৮]। মহানবী (ﷺ) বলেন : "জেনে রেখো আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপও"[৪৯]।

বস্তুতঃ মহানবী (ﷺ)-এর মতো প্রত্যেক নবী রাসূলেরই মহান দায়িত্ব ছিল আল্লাহর কিতাবের মর্মবাণী ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জগদ্বাসীর সামনে বর্ণনা করা এবং তার বাস্তব নমুনা পেশ করা। পবিত্র কুরআন এই দায়িত্বের কথা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছে– "আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব (কুরআন) ও হিকমত (হাদীস) শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকে পথভ্রষ্ট"[৫০]।

পবিত্র কুরআন অন্যত্র বলেছে– "তিনি [নবী (ﷺ)] তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ।"[৫১]

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা আরো বলে– "এই কুরআন আপনার প্রতি নাযিল করেছি যাতে মানুষের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়গুলোকে আপনি স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন।"[৫২]

"বলুন : যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন।"[৫৩]

এ ধরনের বহুবিধ আয়াত ও হাদীস আছে যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাদীস হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত এক প্রকার ওয়াহী। অর্থাৎ- পবিত্র কুরআন হচ্ছে এমন ওয়াহী যার অর্থ ও শব্দ উভয়ই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। আর হাদীস হচ্ছে এমন ওয়াহী যার অর্থ বা ভাব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এবং তা রাসূল (ﷺ)-এর শব্দ বা ভাষায় ব্যক্ত।

হাদীস সংগ্রহ অভিযানের প্রয়োজনীয়তা : মানব জীবনে হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে এখানে কিছু আলোচনা করতে চাই। আল কুরআন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও হাদীসের প্রয়োজন আছে কি? কুরআন-হাদীস, ইসলামের ইতিহাস ও সমসাময়িক অবস্থা গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা এর বিভিন্ন কারণ বা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারব। এক্ষণে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করছি–

১. হাদীস হচ্ছে কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য মহাগ্রন্থ আল কুরআন আবতীর্ণ করেছেন। সাথে সাথে এর বাস্তব দৃষ্টান্ত এবং জীবন্ত ও নির্ভুল ব্যাখ্যাদানের জন্য মহানবী (ﷺ)-কেও প্রেরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন বলছে– "(হে রাসূল!) আপনার কাছে আমি উপদেশবাণী (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি লোকদেরকে তাদের প্রতি নাযিলকৃত সবকিছু বুঝিয়ে দেন"[৫৪]। এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমানিত হচ্ছে যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআন এর তত্ত্ব, তথ্য ও বিধানাবলী নির্ভুলভাবে বুঝা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বর্ণনার উপর নির্ভরশীল এবং এজন্যেই যখন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, মহানবী (ﷺ)-এর চরিত্রমাধুর্য কেমন ছিল? তখন তিনি উত্তরে বলেন : "রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চরিত্র হলো কুরআন"[৫৫]। অর্থাৎ- তিনি ছিলেন জীবন্ত কুরআন। তাঁর থেকে যে কোনো উক্তি, কর্ম, সমর্থন বা গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তা সব কুরআনেরই বক্তব্য। মহামতি ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) একবার মক্কা শরীফে ঘোষণা করলেন : "আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর কুরআন থেকে দিতে পারি।" অতঃপর জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, কোনো লোক ইহরাম অবস্থায় প্রজাপতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) উত্তরদানের শুরুতে কুরআন এর এই আয়াতটি পাঠ করলেন : "রাসূল

[৪৭] *তাদরীবুর রাভী- পৃ. ৬; আল মুখতাসারুল ওয়াজীয- পৃ. ১৬, ১৯; উলূমুল হাদীস- ড. সুবহি সালিহ (দামেস্ক : দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৩ খ্রি.), পৃ. ৩-৫।*

[৪৮] *সূরা আন্ নাজ্ম : ১-৪।*

[৪৯] *সুনান আবী দাউদ- সুলাইমান ইবনুল আশ্ 'আস (বৈরুত : দারুল জায়েল, ১৯৮৭ খ্রি.), হা. ৪৬০৪।*

[৫০] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৬৮।*

[৫১] *সূরা আল আ'রাফ : ১৫৭।*

[৫২] *সূরা আন্ নাহ্ল : ৪৪।*

[৫৩] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩১।*

[৫৪] *সূরা আন্ নাহ্ল : ৪৪।*

[৫৫] *মুসনাদ আহমাদ- আহমাদ ইবনু হাম্বল (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৯৭ খ্রি.), হা. ৪৮১১।*

তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো"[৫৬]। এরপর একটি হাদীস উল্লেখ করে প্রশ্নকৃত সমস্যার সমাধান বর্ণনা করে দিলেন।[৫৭] ঠিক একই প্রসঙ্গ ও মন্তব্য পেশ করতে যেয়ে ইমাম আওযায়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : হাদীস কুরআনের তত মুখাপেক্ষী নয়, কুরআন হাদীসের যত মুখাপেক্ষী।"[৫৮] আর ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "যদি হাদীস না থাকত, তাহলে আমাদের কেউ কুরআন বুঝতো না।"[৫৯]

২. হাদীস কুরআনের মত স্বতন্ত্র ওয়াহী : আল্লাহ পাক মানুষকে হিদায়াতের জন্য যে ওয়াহী পাঠিয়েছেন, তা দু'প্রকার। "ওয়াহী মাতলু" ও "ওয়াহী গায়র মাতলু"। ওয়াহী মাতলু যা সালাতে পঠিতব্য অর্থাৎ- আল-কুরআন। ওয়াহী গায়র মাতলু যা সালাতে পঠিতব্য নয় অর্থাৎ- আল হাদীস। একথা পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত দ্বারা প্রামাণিত। যেমন- আল্লাহ পাক বলেন :

"যখন নবী তাঁর কোনো এক স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিলেন এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী (ﷺ) সে বিষয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন স্ত্রী বললেন, কে আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন? নবী (ﷺ) বললেন যিনি সর্বজ্ঞ তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।"[৬০]

এই আয়াতে উল্লেখিত গোপন কথাটি (মধু পান না করার অঙ্গীকার ফাঁসকরণ প্রসঙ্গ) যেহেতু আল্লাহ মহানবী (ﷺ)-কে জানিয়েছেন সেহেতু তা ওয়াহী। অথচ কুরআনে এরূপ কোনো আয়াত নেই। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, কুরআন ব্যতীত অন্য ওয়াহীও মহানবী (ﷺ)-এর নিকট আসত। তা-ই হচ্ছে হাদীস। রাসূল (ﷺ)-ও বলেছেন : "জেনে রেখো আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপও"।

আল্লাহ বলেন : "তিনি [রাসূল (ﷺ)] প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। তিনি যা বলেন, তা ওয়াহী বৈ কিছু নয়।"[৬১]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, হাদীসও ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ।

৩. হাদীস ইসলামী বিধানের একটি উৎস : মহানবী (ﷺ)-এর হাদীস ইসলামী শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। শরিয়তের প্রথম উৎস আল-কুরআনের মতই মহানবী (ﷺ)-ও বিভিন্ন হালাল-হারাম বা বৈধ-অবৈধ নির্দেশাবলী প্রদান করতেন। পবিত্র কুরআন সে কথা উল্লেখ করেছে এই বলে, "তিনি (নবী) তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ"[৬২]।

মহানবী (ﷺ)-ও বলেছেন : "আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ পাক যা হারাম করেছেন তারই অনুরূপ।"[৬৩]

আর এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, শরিয়তের অনেক বিধি-নিষেধ শুধু হাদীস থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে, যার উল্লেখ কুরআনে নেই। যেমন- আমরা জানি, পবিত্র কুরআনে সকল মৃত প্রাণী এবং রক্ত হারাম। তবে এরই মধ্যে কোন কোন ধরনের মৃত প্রাণী বা রক্ত যে হালাল সে কথা কুরআনের কোথাও বর্ণিত হয়নি। কিন্তু আমরা এও জানি যে, দুই প্রকার মৃত প্রাণী মাছ ও টিড্ডি পাখি এবং দুই প্রকার রক্ত-কলিজা ও যকৃত আমাদের জন্য হালাল। আর এটা একমাত্র হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত।[৬৪]

এমনিভাবে পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও রেশমের কাপড় ব্যবহার করা যে হারাম তাও আমরা কুরআনে পাইনি; রবং হাদীসে পেয়েছি। একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একহাতে স্বর্ণ ও অন্য হাতে রেশমের কাপড় নিয়ে উভয় হাত উপরে উঠিয়ে বললেন : এ বস্তুদ্বয় আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। (কিন্তু) তাদের মহিলাদের জন্য হালাল।[৬৫]

অতএব, ইসলামী শরিয়তে হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজন যে কত অপরিসীম তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪. হাদীস ব্যতীত কুরআনী-বিধান বাস্তবায়ন অসম্ভব : পবিত্র কুরআন হচ্ছে শরিয়তের প্রথম উৎস। এই কুরআনে শরিয়তের মৌলিক বিধানাবলীর বর্ণনা আছে। কিন্তু তাতে এমন অসংখ্য বিধি-বিধান আছে যা এত সংক্ষিপ্ত যে, শুধু কুরআনের উপর নির্ভর করে বা

---

[৫৬] *সূরা আল হাশ্‌র : ৭।*
[৫৭] *আল ইতকান ফী উমুমিল কুরআন- জালালুদ্দীন মুয়ূতী (দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ : দায়িরাতুল মা'আরিফ আল উসমানিয়াহ, ১৩৩২ হি.) খণ্ড : ২, পৃ. ১২৬।*
[৫৮] *মিফতাহুল জান্নাহ- জালালুদ্দীন সুয়ূতী (বুলাক : আল মাতবা আতুল আমীরিয়্যাহ, ১৩৫৪ হি.), পৃ. ৪৩।*
[৫৯] *লামহাত মিন তারীখিস সুন্নাহ- আবূ গুদ্দা (বৈরুতা : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৮৩ ইং), পৃ. ৩২।*
[৬০] *সূরা আত্ তাহ্‌রীম : ৩।*
[৬১] *সূরা আন্ নাজ্‌ম : ৩, ৪।*
[৬২] *সূরা আল আ'রাফ : ১৫৭।*
[৬৩] *সুনান আবী দাউদ- হা. ৪৬০৪।*
[৬৪] *ইবনু মাজাহ্- (কায়রো : আল হালাবী, ১৯৮৩ খ্রি.) হা. ৩৩৭৭।*
[৬৫] *প্রাগুক্ত- হা. ৩৬৬২।*

হাদীসের সাহায্য না নিয়ে সেগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সুতরাং হাদীসের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। উদাহরণ হিসেবে আমরা এখানে কয়েকটি বিধান উল্লেখ করছি।

(ক) সালাত সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে– "তোমরা সালাত কায়েম করা"[৬৬]। কিন্তু সালাতের ওয়াক্তসমূহ, রাকআত সংখ্যা, ক্বিরাআত, সালাতের শর্তাবলী, সালাত ভঙ্গের কারণসমূহ, সালাতের সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদির বিস্তারিত অথচ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা আমরা শুধুমাত্র হাদীস থেকেই পেতে পারি।[৬৭]

(খ) যাকাত সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে– "তোমরা যাকাত আদায় করো"[৬৮]। কিন্তু যাকাত কি? তার নিসাব কত? কখন তা ফর্‌য হয়? কখন আদায় করা ফর্‌য হয়? কতটুকু ফর্‌য? কার উপর ফর্‌য? ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা শুধুমাত্র হাদীস থেকেই জানতে পারি।[৬৯]

(গ) পবিত্র কুরআনে চুরি করার শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে– "তোমরা চোর (পুরুষ-মহিলা উভয়)-এর হাত কেটে দাও।"[৭০] কিন্তু কি পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটতে হবে? কেউ বারবার চুরি করলে তাঁর হাত বারবার কাটতে হবে কিনা? কাটতে হলে কোন পদ্ধতি অবলম্বনে করতে হবে? ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান-সমাধান আমরা একমাত্র হাদীস থেকেই পেয়ে থাকি।[৭১]

(ঘ) কুরআন পাকে সুদ সম্পর্কে কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এই বলে– আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন"[৭২]। কিন্তু কোন ধরনের বস্তুতে সুদ হয়? কোন ধরনের লেন-দেন সুদের অন্তর্ভুক্ত? এবং কোন ধরনের লেন-দেন সুদের অন্তর্ভূক্ত নয়? এ সকল ব্যাপারে আমরা হাদীস থেকে বিস্তারিতভাবে জানতে পারি।[৭৩]

ফলকথা হচ্ছে শরিয়তে এ ধরনের বহু বিধান আছে, যেগুলো সম্পর্কে কুরআন পাকে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে মাত্র। অথচ হাদীসে পাওয়া যাবে তার বিস্তারিত বিবরণ। এমতাবস্থায় যদি কেউ হাদীসকে বাদ রেখে শুধু কুরআনের উপর ভিত্তি করেই কুরআনী বিধানাবলী বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, সে যে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে আছে তা বলারই অপেক্ষা রাখে না।

৫. কুরআনের মত হাদীসও সংরক্ষিত হবার দাবীদার : ইসলামী শরিয়তের প্রয়োজনে কুরআন মাজীদ সংরক্ষিত থাকা যেমন জরুরী তেমনি হাদীসও সংরক্ষিত থাকা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"মু'মিনদের বক্তব্য কেবল একথাই যে, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।"[৭৪]

এ আয়াতে এবং এরূপ অসংখ্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, মু'মিনের প্রকৃত গুণ ও তার মহান সফলতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করার মধ্যেই নিহিত। মহান আল্লাহর আনুগত্য করার অর্থ হলো কুরআনের বিধান মেনে চলা। আর রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করার অর্থ হলো হাদীস মতে 'আমল করা। অতএব, কুরআনের বিধান মেনে চলার জন্য হাদীসকেও সংরক্ষিত থাকতে হবে। অন্যথায় সে মতে 'আমল করা অসম্ভব হবে। আর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে কখনো কোনো অসম্ভব বস্তুর আদেশ দেন না।[৭৫] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

"আল্লাহর আয়াত এবং রাসূল (ﷺ)-এর হিকমত (হাদীস) যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে"[৭৬] এ আয়াতে যে রূপভাবে কুরআনের প্রচার প্রসার ও শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে, তেমনভাবে হিকমত শব্দের মাধ্যমে রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষণ-প্রশিক্ষণও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। অতএব, হাদীস সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক।

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

---

[৬৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪৩।*
[৬৭] *সহীহুল বুখারী- মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী (কায়রো, আল মাতবাআতুস সালাফীয়াহ, ১৯৭৬ খ্রি.), অধ্যায় : সালাত; সহীহ মুসলিম- মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (কায়রো : আল হালাবী, ১৯৮৩ খ্রি.), অধ্যায় : সালাত।*
[৬৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪৩।*
[৬৯] *সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : যাকাত; সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : যাকাত।*
[৭০] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৩৮।*
[৭১] *সুনান আবী দাঊদ- কিতাবুল হুদুদ দ্র.।*
[৭২] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৭৫।*
[৭৩] *সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : বুয়ূ (কেনা-বেচা) দ্র.।*
[৭৪] *সূরা আন্ নূর : ৫০।*
[৭৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮৬।*
[৭৬] *সূরা আল আহ্যা-ব : ৩৪।*

ক্বাসাসুল হাদীস

ওহশী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হত্যার ক্ষতিপূরণ

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

ইসলামের ইতিহাসে সর্ব প্রথম ভুয়া নবুওয়াতের দাবি করেছিল মোসায়লামাতুল কাজ্জাব। খোদ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জবানী সে 'কাজ্জাব' অর্থাৎ- মহামিথ্যাবাদী নামে আখ্যায়িত হয়। ইয়ামামার যুদ্ধে মোসায়লামা ওহশীর হাতে নিহত হয়। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে– জাফর ইবনু 'আম্র ইবনু উমাইয়াহ্ যামরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবায়দুল্লাহ ইবনু আদী ইবনু খিয়ার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে ভ্রমণে বের হলাম। আমরা যখন হিমস নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন উবায়দুল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ওহশীর নিকট যাবেন? আমরা তাকে হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাহাদত বরণ করার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। আমি বললাম, হ্যাঁ যাব। ওহশী তখন হিমস শহরে বসবাস করতেন আমরা তার সম্পর্কে (লোকদেরকে) জিজ্ঞেস করলাম। আমাদেরকে বলা হলো ঐ তো তিনি তার প্রাসাদের ছায়ার মধ্যে পশমহীন মশকের মতো স্থির হয়ে বসে আছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা গিয়ে তার থেকে অল্প কিছু দূরে থামলাম এবং তাকে সালাম করলাম। তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিলেন। জাফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, তখন উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার মাথা পাগড়ি দ্বারা এমনভাবে আবৃত করে রেখেছিলেন যে, ওহশী তার দুই চোখ এবং দুই পা ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। এমতাবস্থায় উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ওহশীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ওহশী! আপনি আমাকে চিনেন কি? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তখন তাঁর দিকে তাকালেন এবং বললেন, না, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে চিনি না। তবে আমি এতটুকু জানি যে, আদী ইবনু খিয়ার উম্মে কিতাল বিনতু আবুল 'ঈসা নামক এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মক্কায় তার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তার দাই খোঁজ করছিলাম, তখন ঐ বাচ্চাকে নিয়ে তার মায়ের সাথে গিয়ে ধাত্রীমাতার কাছে তাকে সোপর্দ করলাম। সে দিনের সে বাচ্চার পা দু'টির মতো যেন আপনার পা দু'টি দেখতে পাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার মুখের পর্দা সরিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদত সম্পর্কে আমাদেরকে খবর দেবেন কি?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। বদর যুদ্ধে হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তুহাইমা ইবনু আদী ইবনু খিযারকে হত্যা করেছিলেন। তাই আমার মনিব জুবায়র ইবনু মুত্ব'ঈম আমাকে বললেন, তুমি যদি আমার চাচার প্রতিশোধ স্বরূপ হামযাহ্কে হত্যা করতে পার তাহলে তুমি আযাদ। রাবী বলেন, যে বছর উহুদ পাহাড় সংলগ্ন আইনাইন পাহাড়ের উপত্যকায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সে যুদ্ধে আমি সকলের সাথে রওয়ানা হয়ে যাই। এরপর লড়াইয়ের জন্য সকলেই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে (কাফির সৈন্যদলের মধ্য থেকে) সিবা নামক এক ব্যক্তি ময়দানে এসে বলল, দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য কেউ প্রস্তুত আছে কি? ওহশী বলেন, তখন হামযাহ্ ইবনু 'আব্দুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বীর বিক্রমে তার সামনে গিয়ে বললেন, হে মেয়েদের খতনাকারিণী উম্মে আনমারের পুত্র সিবা! তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে দুশমনী করছ? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তার ওপর প্রচণ্ড আঘাত করলেন, যার ফলে সে অতীত দিনের মতো বিলীন হয়ে গেল। ওহশী বলেন, আমি হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে কতল করার উদ্দেশ্যে একটি পাথরের নিচে আত্মগোপন করে ওঁত পেতে বসেছিলাম। যখন তিনি আমর নিকটবর্তী হলেন তখন আমি আমার অস্ত্র দ্বারা এত জোরে আঘাত করলাম যে, তার মুত্রথলি ভেদ করে নিতম্বের মাঝখান দিয়ে তা বেরিয়ে গেল। ওহশী বলেন, এটাই হলো তাঁর শাহাদতের মূল ঘটনা। এরপর সবাই ফিরে এলে আমিও তাদের সাথে ফিরে এসে মক্কায় অবস্থান করতে

★ *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

লাগলাম। এরপর মক্কায় ইসলাম প্রসার লাভ করলে আমি তায়েফ চলে গেলাম। কিছুদিনের মধ্যে তায়েফবাসি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে দুত প্রেরণের ব্যবস্থা করলে আমাকে বলা হলো যে, তিনি দুতদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন না। তাই আমি তাদের সাথে রওয়ানা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে গিয়ে হাযির হলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তুমি কি ওহশী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন তুমিই কি হামযাহ্কে হত্যা করেছিলে? আমি বললাম, আপনার কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে ব্যাপারটি তাই। তিনি বললেন, আমার সামনে থেকে তোমার চেহারা কি সরিয়ে রাখতে পার? ওহশী বলেন, তখন আমি চলে আসলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পর (নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার) মুসায়লামাতুল কাযযাব আবির্ভূত হলে আমি বললাম, আমি অবশ্যই মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব এবং তাকে হত্যা করে হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করার ক্ষতিপূরণ করব। ওহশী বলেন, তাই আমি লোকদের সাথে রওয়ানা করলাম এবং তার অবস্থা যা হওয়ার তাই হলো। তিনি বর্ণনা করেন যে, এক সময় আমি দেখলাম যে, হালকা কালো বর্ণের উটের ন্যায় উস্কখুস্ক চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি একটি ভাঙ্গা প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সাথে সাথে আমি আমার বর্শা দ্বারা তার ওপর আঘাত করলাম এবং তার বক্ষের ওপর এমনভাবে বসিয়ে দিলাম যে, তা দু'কাঁধের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এরপর আনসারী এক সাহাবী এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারি দ্বারা তার মাথার খুলিতে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু ফযল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, সুলায়মান ইবনু ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছেন, (মুসায়লামা নিহত হলে) ঘরের ছাদে উঠে একটি বালিকা বলছিল, হায়! হায়! আমীরুল মু'মিনীন (মুসায়লামা)-কে একজন কালো ক্রীতদাস হত্যা করল।[৭৭] ❑

[৭৭] *সহীহুল বুখারী- ই. ফা. বাং, হা. ৩৭৭।*

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

ایاکم وَالْقَوْل فِيْ دين الله تَعَالَى بِالرَّأْيِ عَلَيْكُم بِاتِّبَاع السّنة فَمن خرج عَنْهَا ضل.

"সাবধান! তোমরা মহান আল্লাহর দীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাকো। সকল অবস্থাতেই সুন্নাহর অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।" ***(শা'রানী- মীযানে কুবরা- ১/৯ পৃ:, মুস্তাদরাক হাকিম- ১/১৫)***

«إذا صح الحديث فهو مذهبي».

"কোন বিষয়ে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ! সেটাই (সহীহ হাদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ।" ***(ইবনু আ'বিদান- আল বাহর আর রায়িক-এর হাশিয়ায়- ১/৩৬ পৃ: এবং রাসমুল মুফতী- ১/৪ পৃ:, শাইখ সালিহ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম- ৬২ পৃ:)***

"আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব– কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসের বিপরীত বা পরিপন্থী হয়, তখন আমার কথাকে বর্জন করো (কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরো)।" ***(শাইখ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম, ৫০ পৃ:)***

"আমরা আমাদের কথাগুলো কোন্ দলীল হতে গ্রহণ করেছি এটা অবগত হওয়া ছাড়া আমাদের কথা বা ফাতাওয়া গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়।" ***(ইবনু আব্দিল বার আল ইনতিকা الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأيمة الفقهاء গ্রন্থে ১৪৫ পৃ:, ই'লামুল মুয়াক্কিঈন- ২/৩০৯ পৃ:। ইবনু আবিদিন আল বাহর আল রয়িক এর হাশিয়ায়- ৬/২৯৩ পৃ:, আশ্ শারানী, আল মিযান- ১/৫৫ পৃ:। শাইখ আল ফুলানী, ইকাযুল হিমান- ৫২ পৃ:, ইমাম মুফার হতে সহীহ সনদে প্রমাণিত।)***

বিশেষ মাসায়িল

কুরবানী দেয়া ওয়াজিব নাকি সুন্নত? কুরবানীর পরিবর্তে তার মূল্য দান করা যাবে কি?

"রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" *(সূরা আল হাশর : ৭)*

কুরবানী দেয়া ওয়াজিব না-কি সুন্নত?

কুরবানী দেয়া কি ওয়াজিব না কি সুন্নত? কেউ যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে কুরবানী না দেয় তাহলে কি গুনাহ হবে? এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলব, সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা সুন্নতে মুআক্কাদা। এটিই জুমহুর তথা অধিকাংশ ইমামদের অভিমত। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে তা বাদ দেয়া ঠিক নয়। কিন্তু যেহেতু ওয়াজিব নয় সেহেতু কেউ যদি কুরবানী না করে তাহলে গুনাহগার হবে না –ইন্‌শা-আল্লাহ।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ)'র নিকট ধনী শ্রেণির উপর কুরবানী দেয়া ওয়াজিব। তার নিকট ধনী বলতে তাকে বুঝায় যে যাকাতের নেসাবের মালিক। এমতানুসারে সামর্থ থাকার পর কুরবানী না করলে গুনাগার হতে হবে।

কিন্তু তার ছাত্র আবূ ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ) তা বিরোধিতা করে জুমহুরের সাথে ঐকমত প্রকাশ করেছেন।

যাহোক নিম্নে এ বিষয়ে সাহাবী ও তাবঈদের অভিমত পরিবেশন করা হলো। তাহলে এর মাধ্যমে কুরবানী ওয়াজিব বা সুন্নত হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে –ইন্‌শা-আল্লাহ।

দলিলের আলোকে কুরবানী সুন্নত না কি ওয়াজিব?

জমহুর তথা অধিকাংশ বিদ্বানের মতে কুরবানী দেয়া সুন্নাত বা মুস্তাহাব। আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আবূ মাস'ঊদ বাদারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখ সাহাবী এই মতই প্রকাশ করতেন।[৭৮]

দলিল :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ : «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেছেন : "যিলহজ্জের (প্রথম) দশক প্রবেশ করলে তোমাদের মধ্যে যে কুরবানী দিতে ইচ্ছুক সে যেন তার চুল এবং (শরীরের) চর্ম হতে কিছুই স্পর্শ না করে (অর্থাৎ- না কাটে)।"[৭৯]

ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : উক্ত হাদীসের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কুরবানী দেয়া ওয়াজিব নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : "তোমাদের কেউ যদি কুরবানী করতে ইচ্ছা করে তাহলে সে যেন না করে।" যদি কুরবানী করা ওয়াজিব হতো তাহলে এভাবে বলা হতো; তাহলে সে যেন কুরবানী না দেয়া পর্যন্ত নিজের চুল প্রভৃতি স্পর্শ না করে।"[৮০]

ইমাম আত্ তিরমিযী বলেন :

اَلْعَمَلُ عَلٰى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ.

"এর উপরই আহলে 'ইল্‌মদের 'আমল রয়েছে যে, কুরবানী দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে সেটা নবী (ﷺ)-এর অন্যতম সুন্নাত যার উপর 'আমল করা মুস্তাহাব। এটা সুফিয়ান সাওরী ও 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক প্রমুখদের কথা অভিমত।"[৮১]

সালাফে সালেহীনের অধিকাংশের এটাই অভিমত যে কুরবানী দেয়া ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

হাজীদের কুরবানী প্রসঙ্গ : হাজীগণ হজ্জের মাঠে যে পশু কুরবানী দেয় তাকে আরবীতে 'হাদী' বলা হয়;

[৭৮] *তাফসীর কুরতুবী।*

[৭৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩৯/১৯৭৭।*

[৮০] *বায়হাক্বী ফিস সুনান- ৭/২৬৩; ফিকহুল উযহিয়াহ্- ১২-১৩।*

[৮১] *জামে' আত্ তিরমিযী- ৪/৯২, হা. ১৫০৬, য'ঈফ।*

কুরবানী বলা হয় না। যারা তামাত্তু ও ক্বেরান হজ্জ করেন তাদের উপর এ 'হাদী' যবেহ করা ওয়াজিব। অবশ্য হাজীগণ আলাদাভাবে কুরবানীও করতে পারে। তবে এটা তাদের উপর ওয়াজিব নয়।[৮২]

কুরবানী সুন্নতে মুআক্কাদা হওয়ার ব্যাপারে পূর্বসূরীদের মতামত ও কর্মনীতি : নিম্নে সালাফে সালেহীনের কুরবানী সম্পর্কে কতিপয় বক্তব্য ও কর্মনীতি পরিবেশিত হলো যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কুরবানী দেয়া ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

১ম :

عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِيْ سُرَيْحَةَ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ (ﷺ) وَمَا يُضَحِّيَانِ. عَنْ أَهْلِهِمَا خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ بِهِمَا. أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِيْ مُصَنَّفِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

ইমাম শাবী সুরাইহা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : "আমি আবূ বক্র ও 'উমার (ﷺ)-কে দেখেছি তাঁরা তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী দিতেন না এই আশংকায় যে, মানুষ তাদের এ কাজকে সুন্নত বানিয়ে নিবে।"[৮৩]

২য় :

عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ : قَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيُّ : «إِنِّيْ لَأَدَعُ الْأَضْحَى، وَإِنِّيْ لَمُوْسِرٌ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيْرَانِيْ أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّ».

আবূ ওয়াইল হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মাস'ঊদ আনসারী বলেন : "আমি সচ্ছল হওয়ার পরেও কুরবানী করা পরিত্যাগ করি এজন্য যে, যাতে আমার প্রতিবেশীরা মনে না করে যে তা আমার উপর ওয়াজিব।"[৮৪]

আলোচ্য হাদীসের আ'মাশ 'মুদাল্লেস' হলেও যেহেতু মানসূর তার 'মুতাবাআত' করেছে তাই ওটা আর ধর্তব্য নয়।[৮৫]

৩য় : ইবনু 'উমার (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি কুরবানী সম্পর্কে বলেন :

«هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوْفٌ».

অর্থ : "সেটা সুন্নাত ও সওয়াবের কাজ।"[৮৬]

৪র্থ :

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوَاجِبَةٌ الضَّحِيَّةُ عَلَى النَّاسِ؟ قَالَ : «لَا، وَقَدْ ذَبَحَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ)».

ইবনু জুরাইজ বলেন : আমি আত্বাকে প্রশ্ন করলাম, কুরবানী করা কি মানুষের উপর ওয়াজিব? তিনি বললেন : "না, ওয়াজিব নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরবানী করেছেন।"[৮৭]

কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে হানাফীগণ যে সব দলিল পেশ করেন তা হয় দুর্বল নতুবা দাবীর সাথে মিল নেই।[৮৮]

কুরবানীর পরিবর্তে তার মূল্য দান করা যাবে কি?

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদেরকে বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ফযীলতের বিভিন্ন ধরণের 'ইবাদত দিয়েছেন। প্রত্যেকটি 'ইবাদতের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রয়েছে। তাই কুরআন ও হাদীসে যখন যেভাবে যে 'ইবাদত করার নির্দেশনা এসেছে তখন তা সেভাবে সম্পাদন করাই কর্তব্য।

যেমন- কারো সম্পদের যাকাত ফর্‌য হলে গরীব-অসহায় মানুষের কল্যাণে আর্থিক যাকাত প্রদান করবে এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। হজ্জ ফর্‌য হলে হজ্জ আদায় করবে। রামাযান মাস শেষে খাদ্য দ্রব্য দ্বারা ফিতরা দিবে, কুরবানীর সময় কুরবানী দিবে ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা এ সব বৈচিত্র্যময় 'ইবাদত দিয়েছেন যেন মানুষ বিভিন্ন দিক থেকে মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে এবং বিভিন্ন প্রকার ফযীলত লাভ করতে পারে।

---

[৮২] *দ্র. আল মুগণী ফি ফিক্বহিল হাজ্জে ওয়াল 'উমরাহ্।*
[৮৩] *মুসান্নাফ 'আব্দুর রাযযাক- হা. ৮১৩৯, সনদ সহীহ; দ্র. ফিকহুল উযহিয়্যাহ- হা. ১৫।*
[৮৪] *মুসান্নাফ 'আব্দুর রাযযাক- হা. ৮১৪৯।*
[৮৫] *মুসান্নাফ 'আব্দুর রাযযাক- হা. ৮১৪৮।*
[৮৬] *তালীকে বুখারী, ফাতহুলবারী- ১০/৬; সহীহুল বুখারী- মা. শা., ৭/৯৯।*
[৮৭] *মুহান্নাফ 'আব্দুর রাযযাক- হা. ৮১৩৪, সনদ সহীহ, দ্র. ফিকহুল উযহিয়্যাহ- হা. ১৭।*
[৮৮] *দ্র. ফিকহুল উযহিয়া- পৃ. ১৯।*

নানা যুক্তি ও অজুহাত দাঁড় করিয়ে মহান আল্লাহর দেওয়া বিধানের বিপরীত কাজ করা সমীচীন নয়।

সুতরাং কুরবানীর সময় কুরবানী করাই উত্তম। বিধানগতভাবে এটি সুন্নত মুয়াক্কাদা-মতান্তরে ওয়াজিব।

কুরবানীর পরিবর্তে অন্য কিছু করার বিধান থাকলে অবশ্যই রাসূল (ﷺ) তা বলে যেতেন।

সুতরাং কুরবানী না দিয়ে তার মূল্য টাকা দিয়ে দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করার চিন্তা বর্জনীয়। এ ক্ষেত্রে পশু কুরবানী দিয়ে তার গোশ্তের একটা অংশ গরীবদেরকে দিবেন, পশুর চামড়ার অর্থ তাদেরকে দেবেন (যদি নিজে ব্যবহার না করেন) এবং সম্ভব হলে কিছু আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। তাহলে উভয় দিক থেকে সওয়াব পাওয়া যাবে –ইন্শা-আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক্ব দান করুন –আমিন।

সৌদি আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটির ফাতাওয়া :

الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته (الحي) سنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. (انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة- ١١/٤١٩)

সামর্থ্যবান মুসলিম ব্যক্তি এবং তার (জীবিত) পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর তা জবেহ্ করা অধিক উত্তম তার মূল্য দান করার থেকে।[৮৯]

তবে ইসলাম সবসময় বিশেষ পরিস্থিতিকে ব্যতিক্রমভাবে মূল্যায়ন করে। অর্থাৎ- পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে মানুষ চরম বিপদগ্রস্ত, প্রচণ্ড ক্ষুধা-দারিদ্র্য, হাহাকার, অথবা কোনো গরীব অসহায় ব্যক্তি চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর পথযাত্রী অথচ তাকে সাহায্য করার কেউ নেই অথবা কেউ যদি দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে সে ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে কুরবানী না করে তার অর্থ দ্বারা বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা জায়িয বলে কারো কারো অভিমত রয়েছে। যেমন-

সাওরির সূত্রে 'ইমরান ইবনু মুসলিম থেকে সুওয়াইদ ইবনু গাফলাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি বিলালকে বলতে শুনেছি–

لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا – يعني الأضحية - عَلَى يَتِيْمٍ أَوْ مُغَبَّرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا».

"আমার কাছে একজন ইয়াতীমকে বা ধূলিধূসরিত ব্যক্তিকে এর (কুরবানীর) মূল্য দান করা কুরবানী করার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।" তিনি বলেন, আমি জানি না এটা আসওয়াদ নিজেই বলেছেন নাকি বিলালের বক্তব্য থেকে।[৯০]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ বলেন, নফল দান-সাদাক্বার চেয়ে নফল হজ্জ অধিক উত্তম কিন্তু যদি নিকটাত্মীয়ের মধ্যে অভাবী থাকে তবে তাদেরকে দান করা নফল হজ্জের চেয়ে অধিক উত্তম।[৯১]

আল্লামা মুহাম্মদ বিন সালেহ উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

إذا دار الأمر بين الأضحية وقضاء الدين عن الفقير فقضاء الدين أولى، لاسيما إذا كان المدين من ذوي القربى.

"যদি বিষয়টি কুরবানী করা এবং গরীবদের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধের মধ্যে আবর্তিত হয় তাহলে ঋণ পরিশোধ করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যদি ঋণগ্রহীতা নিকটাত্মীয় হয়।"[৯২] ❑

পরিবেশ দূষণ আমার, আপনার সবার জন্যই ক্ষতিকর। আজকের শিশুরা পরিবেশ দূষণের কারণে নানারকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই আসুন! নতুন প্রজন্মকে একটি সুস্থ, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ উপহার দিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সোচ্চার হই।

[৮৯] *স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটি- ১১/৪১৯।*

[৯০] *মুসান্নাফে 'আব্দুর রাযযাক- হা. ৮১৫৬।*
[৯১] *ফাতাওয়া কুবরা- ৫/৩৮২।*
[৯২] *মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল- ১৩/১৪৯৬।*

সমাজচিন্তা

ইসলামে বৃক্ষরোপণ অন্যতম সাদাক্বায়ে জারিয়াহ

–বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ শামসুল হুদা*

গাছ মানবজাতির জন্য আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের অন্যতম নিয়ামত। আমাদের জাতীয় সম্পদগুলোর মধ্যে গাছ অন্যতম। ইসলামে বৃক্ষ রোপণ ও ফসল ফলানোকে সবিশেষ সওয়াবের কাজ হিসেবে সাদাক্বায়ে জারিয়া বা অবিরত সাদাক্বাহ্ আখ্যায়িত করা হয়েছে। মানুষ মৃত্যুর পরও সাদাক্বায়ে জারিয়ার সওয়াব অব্যাহতভাবে পেতে থাকবে। নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

“যখন কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করে তার সমস্ত ‘আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি ব্যতিত– **১.** যদি কোনো সাদাক্বায়ে জারিয়া রেখে যায়, **২.** অথবা এমন জ্ঞান রেখে যায় যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, **৩.** অথবা কোনো সৎ সন্তান রেখে যায়, যে তার জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করে।”

এই তিনটি ভালো কাজের ফল সে পেতে থাকে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি একটি বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা করেন, তাহলে ওই গাছটি যতদিন তার উপকার গ্রহণ করবে ততদিন সে বেঁচে থাকবে এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু যতদিন ব্যক্তির ‘আমলনামায় পুণ্যের সওয়াব লেখা হতে থাকবে।

পবিত্র কুরআনুল করীম হাদীসে নব্বীতে বৃক্ষরোপণকে নানাভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। গাছ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন ইরশাদ করেন–

﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾

“এবং তৃণলতা ও বৃক্ষরাজি সিজদারত আছে।”[৯৩]

অন্য আয়াতে কারিমায়ও এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَهُوَ الَّذِيْ أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوْشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

“তিনিই (আল্লাহ) লতা ও বৃক্ষ উপাদানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন, এগুলো একে-অন্যের সদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে তার হক্ব প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।”[৯৪]

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ﴾

“ওরা কি জমিনের দিকে লক্ষ করে না? আমি তাতে নানা রকমের কতো উৎকৃষ্ট গাছপালা উদগত করেছি।”[৯৫]

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন আরো ইরশাদ করেন–

﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ ○ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ﴾

“তোমার যে বীজ বপন করে সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি একে অঙ্কুরিত করো, না আমি অঙ্কুরিত করি?”[৯৬]

﴿هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ﴾

“তিনিই (আল্লাহ) আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশুচারণ করে থাকে।”[৯৭]

---

* *সম্পাদক, সাপ্তাহিক দিনাজপুরের কাগজ। রিপোর্টার, দৈনিক ইত্তেফাক ও দি নিউ নেশন। পার্বতীপুর, দিনাজপুর।*

[৯৩] *সূরা আর্ রহ্মা-ন : ৬।*

[৯৪] *সূরা আল আন‘আম : ১৪১।*

[৯৫] *সূরা আশ্ শু‘আরা- : ৭।*

[৯৬] *সূরা আল ওয়া-ক্বি‘আহ্ : ৬৪-৬৫।*

[৯৭] *সূরা আন্ নাহ্ল : ১০।*

প্রাণিকুলের পরম বন্ধু গাছ। গাছ না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণীকুল থাকবে না। প্রাণীকুল বেঁচে থাকার প্রধান উপাদান অক্সিজেন। সেই অক্সিজেন আসে গাছপালা থেকে। মানুষ কার্বনডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে যা বিষাক্ত পদার্থ। এই বিষাক্ত পদার্থ পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, এই ক্ষতিকর পদার্থ গাছ গ্রহণ করে। গাছের সবুজ পাতার ক্লোরোফিল এবং সূর্যের আলো মিলে এক ধরনের রন্ধন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কার্বনডাই-অক্সাইডকে অক্সিজেনে পরিণত করা হয়। পৃথিবীর কোথাও কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে অক্সিজেন করার কারখানা নেই। এ ব্যবস্থা আল্লাহপাক তার আপন কুদরতে প্রাণিকূলের জন্য ঠিক করে রেখেছেন। বিষয়টি অনুধাবন করেই মহানবী (ﷺ) বলেছেন,

"যদি তুমি নিশ্চিতভাবে জানো যে কালই কিয়ামত (ধ্বংসযজ্ঞ) হবে; তবে আজই গাছ, লাগাও।"

তিনি জানতেন, মানুষকে কেন্দ্র করেই সমগ্র সৃষ্টিজগতের এত এত আয়োজন।

প্রিয়নবী (ﷺ) বৃক্ষরোপণের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। আবূ আইয়্যূব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন,

"যে ব্যক্তি বৃক্ষরোপণ করে অতঃপর সেই বৃক্ষে যতো ফল উৎপন্ন হয়, আল্লাহ উৎপাদিত ফল পরিমাণ সওয়ার তার 'আমলনামায় প্রদান করবেন।"[৯৮]

আবার জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেন, "কোনো মুসলমান বৃক্ষরোপণ করলো, অতঃপর তার থেকে যতটুকু অংশ ভক্ষণ করা হয়, সেটা বৃক্ষরোপণকারীর জন্য সাদাক্বাহ্ হয়ে যায়। আর যে অংশটুকু চুরি হয়ে যায়, সেটাও তার জন্য সাদাক্বাহ্ হয়ে যায়। আর যতটুকু অংশ পাখি খায়, সেটাও তার জন্য সাদাক্বাহ্ হয়ে যায়। অর্থাৎ- যে কেউ ঐ গাছ থেকে সামান্য কিছু ফল ভক্ষণ করে, মহান রাব্বুল 'আলামীন-এর বিনিময়ে বৃক্ষরোপণকারীকে সাদাক্বার পূণ্য দান করেন।"[৯৯]

গাছ-গাছালি ও বৃক্ষরাজি মানবজাতির পরম হিতৈষী বন্ধু। গাছের ফলমূল মানুষ ও প্রাণীকূলের প্রিয় খানা, যা শরীরের পুষ্টি সাধন করে এবং রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এছাড়া বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে সৃষ্টজীবের জীবন রক্ষাকারী ঔষধের উপাদান। গাছপালা ও লতাগুল্মের সাহায্যে পৃথিবীর উষ্ণতা হ্রাস পেয়ে প্রকৃতি এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয়। আবহাওয়া আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ রাখতে, জলীয় বাষ্প পূর্ণ বাতাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বৃষ্টিপাত ঘটাতে, ভূমিক্ষয়, বন্যা, ঝড়-তুফান ও ঘূর্ণিঝড় রোধ করতে এবং মাটিকে 'সরস ও উর্বর করতে বৃক্ষরাজি ও তরুলতা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। গাছপালা মানুষের রান্নাবান্নার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গাছ আমাদের পরম বন্ধু ও প্রতিবেশি। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিবিধান মতে গাছ ছাড়া কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। জন্মের পর মানুষের মুখে মধু দেওয়া হয় সেই মধু বৃক্ষ থেকেই আসে। অহেতুক কোনো গাছের পাতা ছেঁড়াও অন্যায়। কারণ ঐ পাতাটিও আল্লাহ তা'আলার যিক্রে মশগুল। যদি বিশেষ প্রয়োজনে একটি গাছও কাটতে হয়, তবে এর পরিবর্তে দু'টি বৃক্ষরোপণ করা নবী আদর্শের অনুপম শিক্ষা।

রাসূল করীম (ﷺ) একবার দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তার বাহন থেমে গেল। রাসূল (ﷺ) বললেন, এ দুই কবরে আযাব হচ্ছে। এদের একজন চোগলখোরি করত, অপরজন পেশাব করে পবিত্রতা অর্জনে অবহেলা করত। অতঃপর রাসূল (ﷺ) বাহন থেকে নেমে কবরবাসী দুই ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য দু'আ করলেন এবং কবরের পাশে দু'টি গাছের ডাল রোপণ করলেন।[১০০] বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূল (ﷺ) যুদ্ধে যখন কোনো বাহিনী পাঠাতেন, তখন তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, সাবধান। বিজিত অঞ্চলের কোনো বৃক্ষ কর্তন করা যাবে না।

পৃথিবীর সবচেয়ে উপকারী গাছ নিম। পাশ্চাত্যে নিম গাছকে 'মিরাকল ট্রি' বলে। এই গাছ ভিলেজ ফার্মেসী হিসেবে পরিচিত। নিম গাছের শিকড়, কাণ্ড, ডাল, পাতা, ফুল ও ফল সবই মানুষের উপকারে লাগে। নিমের জন্মস্থান মায়ানমার। এটি Meliaceae

[৯৮] *মুসনাদে আহমাদ।*
[৯৯] *সহীহ মুসলিম।*
[১০০] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম ও সুনান আবূ দাউদ।*

পরিবারের একটি বৃক্ষ। এর বৈজ্ঞানিক নাম Melia aradirachta পৃথিবীর প্রায় সবদেশে নিম গাছ জন্মে।

নিমের পাতার রস ঘা, ফোঁড়া, চুলকানি, চর্মরোগ, গুটি বসন্ত, খোসপাঁচড়া, জলবসন্ত, হাম, ব্রণ, জ্বর, সর্দি, কাশি, অরুচি, বদহজম, কৃমি, কফ, বমি, কুষ্ঠ, হিক্কা, প্রমেহ রোগ সারায়। নিমের বীজের তেল মাথা ঠান্ডা রাখে, উঁকুন মারে, চুল বাড়ায়, চুলপড়া বন্ধ করে, খুসকি দূর করে। নিমের বাকল বাতরোগ ও জ্বরে খুব উপকারী। নিম গাছের ডাল দিয়ে প্রতিদিন দাঁত মাজলে দাঁতের কোনো রোগ হয় না। নিমের আঠা ও ফল থেকে শক্তিবর্ধক টনিক তৈরি হয়। ১০টি নিম পাতা ও ৫টি গোল মরিচ চিবিয়ে খেলে রক্তের শর্করা কমিয়ে ডায়াবেটিস রোগীদের উপকার করে। নিম বীজের তেল দিয়ে ২০০ প্রজাতির ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন করা যায়। নিম গাছের কাছে মশা যায় না। নিমের তৈরি টুথপেস্ট, সাবান, তেল, লোশন, শ্যাম্পু, বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে। নিমের কাঠ খুব উন্নতমানের। ঘর নির্মাণ, আসবাবপত্র তৈরী, নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ করা যায়। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) পরীক্ষা করে দেখেছে যে, নিমের খৈল ধানের সহজলভ্য এমোনিয়াম নাইট্রোজেনকে নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে যা মাটিকে নাইট্রেট লবণমুক্ত করতে সাহায্য করে।

পরিশেষে বলতে চাই, গাছ মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু। এমন উপকারী বন্ধু ইহজগতে মানুষের আর নেই। বাঁচতে গেলে মানুষের জন্য যা অপরিহার্য, গাছ মানুষকে সেই জীবনরূপী অক্সিজেন যোগায়। শুধু তাই নয়, যা নিঃশ্বাসের জন্য ক্ষতিকর, পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর, সেই কার্বনডাই-অক্সাইড শুষে ফেলার ক্ষমতাও রয়েছে গাছের। গাছপালা সোভিত এক হেক্টর সবুজ বনভূমি বায়ু স্তর থেকে শোষণ করতে পারে। ৭ টন কার্বনডাই-অক্সাইড এবং বায়ু স্তরে ছড়িয়ে দিতে পারে ২ টন অক্সিজেন একটা আমগাছ পাঁচজনের এক পরিবারের বাৎসরিক অক্সিজেন চাহিদা মেটাতে পারে। গরমের দিনে এই একটা আমগাছ মাটির নীচ থেকে ১০০ গ্যালনের মতো পানি শোষণ করে বাতাসে সেই স্নিগ্ধতা ও শীতলতা ছড়িয়ে দিতে পারে। এর ফলে গাছের চারপাশে তাপের মাত্রা অনেক কমে যায় গাছের পানি শোষণ থেকে।

বিখ্যাত ডাচ নৃবিজ্ঞানী ফ্রান্সিসকো ডি চাটেলের মতে, পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর কিছু অংশ মরুময়তা এবং পানি স্বল্পতা, অন্য অংশে বন্যা ও ঝড়ের প্রকোপ বেড়ে গেছে। এসব জটিল প্রাকৃতিক সম্পদকে সফলভাবে মোকাবিলার জন্য এখনই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ইসলামের শিক্ষা মেনে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

বর্তমানে আমাদের দেশে গাছ রোপণ করার পরিবর্তে গাছ কেটে সাবাড় করার প্রতিযোগিতা চলছে। ১৯৪৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বনজঙ্গলের পরিমাণ ছিল ভূমির অনুপাতে শতকরা ৩৩ ভাগ, ১৯৫৪ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ২৯ ভাগ। ১৯৭১ সালের আগ পর্যন্ত বনজঙ্গলের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগের কাছাকাছি ছিল। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে গাছপালার উপর একশ্রেণীর মানুষের নির্দয় ও নিষ্ঠুর আচরণ সীমা ছাড়িয়ে গেছে, বনভূমির পরিমাণ কমেছে অতি দ্রুত এবং সরকারী হিসাব স্বীকার করুক বা না করুক দেশে বনভূমির পরিমাণ শতকরা ৭ ভাগের বেশি নয় কিছুতেই। গাছপালা বনজঙ্গল কেটে সাফ করার জন্য সরকারি বন বিভাগের দূর্নীতি পরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মীরা এবং অবৈধ কাঠ ব্যবসায়ীরা দায়ী। বনজঙ্গল রক্ষার জন্য থাইল্যান্ডে সেনাবাহিনী মোতায়েন হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। সে কারণে আমাদের দেশের বনজঙ্গল রক্ষার জন্য কঠোরভাবে দৃষ্টি দেয়া দরকার।

তাই গাছ লাগার সময়কালে বাড়ির পাশের ফাঁকা জায়গায়, পুকুরপাড়ে, খাল বা নদীর ধারে, রস্তার পাশে, বাঁধ বা রেললাইনের পাশে, স্কুল কলেজ-মাদ্‌রাসায়, অফিস-আদালত, ঈদগাহ, কবরস্থানের খালি জায়গায় বৃক্ষরোপণ করে আমরা সবাই ইহকালীন ও পরকালীন উপকার লাভ করতে পারি। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সবাইকে সেই তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

আত্মগঠন

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষার নানান দিক

–মো. আরিফুর রহমান*

[চতুর্থ (শেষ) কিস্তি]

চরিত্র শিক্ষা বিষয়ে আমরা যে আলোচনা করি না কেন মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জীবনীতে আমাদের ফিরে যেতেই হবে। একজন মানুষ কীভাবে চরিত্রবান হয়ে উঠবে সে শিক্ষা আমরা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) থেকে পাই। রাসূল (ﷺ) ছিলেন সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা 'উত্তম আদর্শ' হিসাবে উল্লেখ করে বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[১০১]

প্রতিনিয়ত খবরের পাতা খুললে আপনারা দেখতে পাবেন। আমাদের চরিত্রে বড় ধরনের নেতিবাচক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখান থেকে আমাদের ফিরে আসতেই হবে। আমরা আমানতের খেয়ানত করছি, আমাদের দায়িত্বে অবহেলা করছি, আমরা ক্ষমতার যাচ্চেতাই ব্যবহার করছি। এই অবস্থা থেকে আমরা মুক্ত হতে চাই। তাই জীবনের শুরু বা যখনই আমরা বুঝতে শিখি তখন থেকে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার পূর্বেই আমাদেরকে সুচরিত্র অনুশীলনের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ছোটোবেলা থেকেই যেন আমরা ভালো চিন্তা করতে পারি, ভালোটা ভাবতে পারি, অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারি, আমানত রক্ষা করতে পারি, আস্থা ধরে রাখতে পারি, দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারি সেই উদ্যোগ নিতেই হবে।

প্রথমে আমরা আজ I-Care Rules in Character নিয়ে আলোচনা করবো। আই-কেয়ার রুলসের পাঁচটি মূলমন্ত্র আছে। এগুলো সম্পর্ক তৈরিতে, অভ্যাস সৃষ্টিতে, চরিত্র গঠনে সর্বোপরি একজন চরিত্রবান মানুষ বা সু-নাগরিক হতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা শপথ নিই এই পাঁচটি নিয়ম অনুসরণ করার।

১. আমরা একে অপরের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবো।

২. আমাদের হাত মানুষের সহযোগিতা করার জন্য, কাউকে আঘাত করার জন্য নয়।

৩. আমরা I-Care ভাষা (Language) ব্যবহার করবো (নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো)।

৪. আমরা অন্যের অনুভূতির প্রতি যত্নশীল হবো।

৫. আমরা যে কথা বলি এবং যে কাজ করি মনে রাখতে হবে তার জন্য আমরাই দায়বদ্ধ।

I-Care Language (যে রকম ভাষা ব্যবহার করবো) : আমি তোমাকে পছন্দ করি, আমি কি তোমাকে সহযোগিতা করতে পারি? দয়া করে (Kindly, Please) এই কাজটি আমাকে করে দাও, দয়াকরে আমাকে ক্ষমা করো, ধন্যবাদ (Thank you), তুমি কি আমাদের সাথে যোগদান করবে? এসো বন্ধু হও, তুমি চমৎকার মানুষ। এগুলো মূলত ইতিবাচক কথা। এখানে আমরা ইসলামিক সংস্কৃতিও চর্চা করতে পারি। ধন্যবাদ না বলে 'আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন' বাক্য ব্যবহার করতে পারি।

যে রকম শব্দ পরিহার করবো : তুমি বিরক্তিকর, এখান থেকে বের হয়ে যাও, কেউ তোমাকে পছন্দ করে না, তোমাকে কুৎসিত দেখায়, ওটা দাও, তুমি কী ভাবো তা আমি গন্য করি না। এগুলো নেতিবাচক কথা। এর মাধ্যমে অন্য মানুষ কষ্ট পায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, চরিত্রবান মানুষের হাত ও জিহবা হতে অন্য মানুষ নিরাপদ থাকবে।

চরিত্রে সামাজিক ও আবেগীয় উন্নয়নের লক্ষ্য : শ্রেণিকক্ষে চরিত্র এবং সু নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীদের পথ দেখাতে পারেন। এ সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনা করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের চিন্তার জগতকে নাড়া দিতে পারেন। আমরা এখানে কিছু আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করলাম।

- নিজেদের এবং অন্যদের অনুভূতিকে মূল্যায়ন করা এবং সেগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করা।
- নিজের এবং অন্যেও ভালোর জন্য দায়িত্ব নেওয়া।
- শ্রেণিকক্ষ পরিবেশের উপর শ্রদ্ধাশীল/যত্নশীল থাকা।

---

* *আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার।*

[১০১] *সূরা আল আহ্যা-ব : ২১।*

- ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সব ধরণের শিশুদের সাথে মেশা/খেলাধুলা করা।
- একে অন্যের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা এবং সচেতনতা তৈরি করা।
- দ্বন্দ্ব নিরসনে চিন্তার দক্ষতা কাজে লাগানো।
- সাপ্তাহিক চরিত্র গঠন, লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তা অনুশীলনে আলোচনা করা।

সাপ্তাহিক/মাসিক চরিত্র গঠনে আলোচ্য বিষয় : চরিত্র গঠন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং কমিউনিটির মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। মোটকথা, চরিত্র এবং সুনাগরিকতা অর্জনের জন্য একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার। আর এই পরিবেশ সৃষ্টিতে সকলের অংশগ্রহণ একান্ত কাম্য। স্কুলে শিক্ষার্থীদের সাপ্তাহিক এবং মাসিক মিটিংয়ে আমরা যে বিষয় আলোচনা করতে পারি তার কিছু নমুনা প্রদান করা হলো। এগুলো শুধু আলোচনা নয় এসব নিয়ে শ্রেণিভিত্তিক বিতর্ক, উন্মুক্ত আলোচনা এবং উপস্থিত বক্তৃতা প্রদান অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

- পারিবারিক অশান্তির কারণ : নিরসনে আমাদের দায়িত্ব।
- ইভটিজিং : প্রতিরোধে আমাদের ভূমিকা।
- মাদকের কালো থাবা : চিহ্নিত ও সমাধানে আমাদের করণীয়।
- দেশপ্রেম বলতে সত্যিকারভাবে কী বুঝায়?
- ব্যস্ত সভ্যতায় শিশুদের সঙ্কট : আমাদের করণীয়।
- পরিবারের কাজ : আমাদের করণীয়।
- মোবাইল, ফেইসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার : আমাদের করণীয়।

এছাড়াও শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা আলোচনায় স্থানীয় সমস্যা তুলে ধরতে পারে। গঠনমূলক আলোচনা করতে পারে।

Brainstorming in Character-3

আমরা চরিত্র সম্পর্কে আলোচনার তৃতীয় কিস্তিতে Brainstorming in Character 1, 2 আলোচনা করেছি। আজ আমরা এর ৩ নম্বরটি আলোচনা করবো। কোনো পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য Brainstorming খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মাধ্যম। এর মাধ্যমে একটা দলের সকলেই সক্রিয় হতে পারে। সকলে কিছু না কিছু অবদান রাখতে পারে। Brainstorming-এর আর একটা সুবিধা হলো এর মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে সফল মনে করে, তৃপ্তি পায়। বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের এবং চিন্তার শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা যখন এক জায়গায় বসে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে বা কিছু বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে তখন নানা রকম ফলাফল পাওয়া যায়। সৃজনশীলতার বিকাশ হয়। চরিত্র, নৈতিকতা, মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর এবং Brainstorming-এর কিছু নমুনা দেওয়া হলো। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা নিয়মিত সাপ্তাহিক এবং মাসিক মিটিংয়ে এগুলো নিয়ে আলোচনা করবে।

- চরিত্র কী? একজন চরিত্রবান মানুষকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?
- তোমার স্কুলের কোন বিষয়টি তোমার সব চেয়ে বেশি পছন্দ হয়? কোনটা সব থেকে অপছন্দ হয়?
- তুমি কি মনে করো তুমি স্কুলের জন্য মূল্যবান একজন? কিছু উদাহরণ দিতে পারবে?
- তুমি কি স্কুলে নিজেকে নিরাপদ মনে করো? কীভাবে ব্যাখ্যা করবে যে তুমি স্কুলে নিরাপদ আছো?
- স্কুলে তুমি কতটা সফল? এটা কি আনন্দদায়ক না ঝুঁকিপূর্ণ? স্কুলের কোন বিষয়টি তোমার কাছে ঝুঁকিপূর্ণ বা চ্যালেঞ্জিং মনে হয়?
- মোটিভেশন বা অনুপ্রেরণা বলতে তুমি কী বুঝো? তোমার স্কুলে কি তুমি অনুপ্রেরণা পাও? কীভাবে শিক্ষক তোমাকে অনুপ্রাণিত করেন?
- তুমি স্কুলে কখনো কখনো একাকি অনুভব করো? তুমি কি স্কুলে স্ট্রেস বা মানসিক চাপ অনুভব করো? এই চাপ অনুভব কেন করো?
- তুমি কি শিক্ষকদের উপর আস্থা রাখো?
- তুমি কেন বলবে যে এই কমিউনিটির তুমি একজন ভালো চরিত্রের মানুষ? উদাহরণ দিতে পারবে?
- তোমার অনুকরণীয় আদর্শ কে? কেন?
- স্কুলের বেঞ্চ বা দেয়ালে অপ্রয়োজনীয় লেখালেখি বা নোংরা দাগ দেখলে তোমার কেমন লাগে?
- শ্রেণিকক্ষ অপরিস্কার থাকলে তোমার কেমন অনুভূত হয়?
- নিজেদের শ্রেণিকক্ষ নিজেরা পরিস্কার করতে কেমন লাগে তোমার?

Ethical Test in Character

নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আমরা চারিত্রিক ধারণা পেতে পারি। কারোর

চরিত্র মূল্যায়ন বা ভালো চরিত্র বা খারাপ চরিত্র যাচাই করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো চরিত্র শিক্ষা, জানা এবং চরিত্র গঠন করা। নিচের লেখাগুলো নিয়ে আমরা একটা ছক তৈরি করতে পারি। এই ছক সততার সাথে পূরণ করে আমরা নিজেকে মূল্যায়ন করবো এবং কোথাও আরও উন্নতি করার দরকার হলে পর্যায়ক্রমে অনুশীলন করবো।

তুমি স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করেছো : *(বছরে ৬-৯ বার)/(বছরে ৩-৫)/(বছরে ১-২ বার)/(একবারও না)*, **তুমি স্কুলের পরীক্ষায় নকলের/প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছো :** *(বছরে ৬-৯ বার)/(বছরে ৩-৫)/(বছরে ১-২ বার)/(একবারও না)*, **তুমি শিক্ষককে অশ্রদ্ধা করেছো :** *(বছরে ৬-৯ বার)/(বছরে ৩-৫)/(বছরে ১-২ বার)/(একবারও না)*, **কোনো অজুহাত ছাড়াই স্কুলে আসনি :** *(বছরে ৬-৯ বার)/(বছরে ৩-৫)/(বছরে ১-২ বার)/(একবারও না)*, **কষ্ট পেয়েছে এমন কাউকে সান্ত্বনা দিয়েছো :** *(বছরে ৬-৯ বার)/(বছরে ৩-৫)/(বছরে ১-২ বার)/(একবারও না)*, **বিনা মূল্যে প্রতিবেশীকে সহায়তা করেছো :** *(বছরে ৬-৯ বার)/(বছরে ৩-৫)/(বছরে ১-২ বার)/(একবারও না)*, **অসহায় মানুষকে টাকা, কাপড়, ঔষধ দিয়ে সহযোগিতা করেছো :** *(বছরে ৬-৯ বার)/(বছরে ৩-৫)/(বছরে ১-২ বার)/(একবারও না)*, **খাবার নেই এমন মানুষের সাথে নিজের খাবার ভাগাভাগি করেছো :** *(বছরে ৬-৯ বার)/(বছরে ৩-৫)/(বছরে ১-২ বার)/(একবারও না)*, **তোমার ক্লাসমেটকে হোমওয়ার্ক করতে সহযোগিতা করেছো :** *(বছরে ৬-৯ বার)/(বছরে ৩-৫)/(বছরে ১-২ বার)/(একবারও না)*, **অপরিচিত মানুষকে তার বোঝা বহন করে সহযোগিতা করেছো :** *(বছরে ৬-৯ বার)/(বছরে ৩-৫)/(বছরে ১-২ বার)/(একবারও না)*।

এখানে দুই ধরনের কাজ নিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। নেতিবাচক এবং ইতিবাচক। নেতিবাচক কাজে বছরে যত কম হবে ততো ভালো। ইতিবাচক কাজ বছরে যত বেশি হবে তত ভালো। এগুলো আমরা স্কুলে বা মাদ্‌রাসায় অনুশীলন করতে পারি।

চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটা বাক্য আমার নজর কাড়লো। আপনারাও দেখতে পারেন।

"When someone hurts us, we should write it down in the sand. The wind can erase it away. But when someone does something good for us, we should engrave it on stone, so no wind can erase it."

অর্থ : *"কেউ আমাদের আঘাত করলে আমাদের উচিত তা বালুতে লিখে রাখা। বাতাস তা মুছে দিবে। কিন্তু কেউ যখন আমাদের জন্য ভালো কিছু করে আমাদের উচিৎ তা পাথরে খোদায় করে রাখা, কোনো বাতাস তা মুছে দিতে পারবে না।"*[১০২]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "নিশ্চয়ই আমি চারিত্রিক গুণাবলি পরিপূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।"[১০৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

"নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"[১০৪]

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, *"জেনে রাখো! পুরো কুরআনই হলো রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চরিত্র।"* অর্থাৎ- তিনি ছিলেন আল-কুরআনের বাস্তব নমুনা।[১০৫]

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সবসময় কামনা করতেন তাঁর প্রিয় উম্মতরা চরিত্রবান হোক। তিনি বলেন, *"যে তার চরিত্র সুন্দর করবে আমি সর্বোত্তম জান্নাতে তার জন্য ঘরের জামিনদার হব"*[১০৬]। তিনি আরও বলেন, *"নিশ্চয় কিয়ামতের দিনে তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং আমার মজলিশের সবচেয়ে কাছে তারাই থাকবে যারা তোমাদের ভেতর সর্বোত্তম চরিত্রবান।"*[১০৭]

তিনি মানুষকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, *"যে ব্যক্তি নম্র-বিনয়ী হয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে উচ্চাসনে আসীন করেন আর যে অহংকারী হয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে অপদস্থ করেন"*[১০৮]।

চরিত্র ইসলাম ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমরা পবিত্র কুরআন এবং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা এবং কাজের মাধ্যমে তা বুঝতে পারি। চরিত্র শিক্ষা পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী দিয়েই শুরু করা উচিত। *[সমাপ্ত]*

---

[১০২] *Collected from ENGLISH FOR TODAY- for class seven, p. 23, 2016।*
[১০৩] *মুসনাদে আহমাদ।*
[১০৪] *সূরা আল ক্বলম : ৪।*
[১০৫] *মুসনাদে আহমাদ।*
[১০৬] *সুনান আবূ দাঊদ।*
[১০৭] *জামে' আত্ তিরমিযী।*
[১০৮] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ।*

বিস্ময়-বৈচিত্র

ক্বলব বা অন্তর : মানবদেহের কেন্দ্রবিন্দু

–মো. হারুনুর রশিদ★

[পর্ব– ০২]

অসুস্থ ক্বলবের আলামত : অসুস্থ ক্বলবের অসংখ্য আলামত রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

(ক) অধিকাংশ সময় এরা ঐ সকল কাজে অনীহা প্রকাশ করে যে সকল উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন- 'ইল্‌ম অর্জন, হিকমতের সাথে কাজ সম্পাদন, তাওহীদের জ্ঞানার্জন, সকল প্রকার 'ইবাদত সম্পাদন ইত্যাদি বিষয়ে তারা অনীহা প্রকাশ করে থাকে।

(খ) সবচেয়ে নিকৃষ্ট, ধ্বংসাত্মক, অমার্জনীয় রোগ হলো অহংকার, যা ক্বলবকে সত্য গ্রহণে বাধা প্রদান করে। এটাই সর্বপ্রথম পাপ, যা ইবলীস করেছিল। এর ফলে সে শয়তানে পরিণত হয়। এই অহংকারই তাকে আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সিজদা করতে বাধা প্রদান করেছিল।

(গ) ধর্মে সন্দেহ পোষণ, বিকৃত মাসাআলাহ প্রচার, শির্ক-বিদআতের মায়াজালে আবদ্ধ থাকাও ক্বলবের রোগের নিদর্শন। এমনকি এতে কাফির অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

(ঘ) কারণে-অকারণে দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা, উদ্বিগ্নতা, উৎকণ্ঠা, দুঃখ, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ক্বলবের রোগের আলামত।

(ঙ) হত্যা, সন্ত্রাস, ঘুষ, সুদ, চাঁদাবাজি, মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন, ওযনে কম দেওয়া, গান-বাজনায় মত্ত, অশ্লীলতা যাবতীয় অশালীন কর্মকাণ্ডের সাথে যারাই জড়িত হবে, তাদের ক্বলবেই রোগ রয়েছে বলে বুঝে নিতে হবে।

প্রতিকার : ক্বলবের রোগের প্রতিকার বা চিকিৎসা করতে হলে রোগীর উচিত সত্যের আশ্রয় নেয়া, বেশি বেশি করে নফল সালাত আদায় করা, গভীর রাতে সালাতে অশ্রু ঝরানো, সকল প্রকার পাপ পরিহার করা। আল্লাহ বলেন–

﴿وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।"[১০৯]

এ জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবনাদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করা অতীব জরুরি। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا﴾

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।"[১১০]

ক্বলবের চিকিৎসায় সুন্নাতি যিক্‌র চির সঙ্গী করা একান্ত কর্তব্য। কারণ যিক্‌র ক্বলবের সকল প্রকার ময়লা দূরীভূত করতে সক্ষম। উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রচলিত মিথ্যা, বানোয়াট ও ভেজাল প্রক্রিয়ার যিক্‌র সবার জন্যে সর্বদা পরিতাজ্য। যেমন- ছেলে-মেয়ে একাকার হয়ে অন্ধকারে সমস্বরে 'ইল্লাল্লাহ' ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ-আল্লাহ, হু-হু ইত্যাদি যিক্‌র। এ ধরনের যিক্‌র ক্বলবের রোগ আরো বৃদ্ধি করে। নিম্নে কুরআন এবং হাদীস থেকে কিছু যিক্‌র উল্লেখ করা হলো–

উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রায়ই নিম্নে বর্ণিত দু'আটি পাঠ করতেন–

يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ.

"হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর স্থির রাখুন।"[১১১]

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

"হে আমার প্রতিপালক! আমাদের পথ-প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আমাদেরকে আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন, নিশ্চয়ই আপনি প্রচুর প্রদানকারী।"[১১২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই দু'আটিও পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ.

"হে ক্বলব পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের ক্বলবগুলোকে আপনার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দিন।"[১১৩]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ

★ *ফারাক্কাবাদ, বিরল, দিনাজপুর।*

[১০৯] *সূরা আল 'আনকাবূত : ৬৯।*

[১১০] *সূরা আল আহ্যা-ব : ২১।*

[১১১] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২১৪০, ৩৫২২; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮৩৪, হাদীস সহীহ।*

[১১২] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৮।*

[১১৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৫৪।*

وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَاتَشْبَعُ وِمِنْ دَعْوَةٍ لَايُسْتَجَابُ لَهَا.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি অক্ষমতা ও আলস্য থেকে, কার্পণ্য ও বার্ধক্য থেকে এবং কবরের 'আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমার ক্বলবে তাক্বওয়া দান করুন এবং তাকে পাক করে দিন, আপনি সবচাইতে পাক-পবিত্রকারী। আপনি তার অভিভাবক ও মালিক। হে আল্লাহ! আপনার কাছে আশ্রয় চাই অপকারী 'ইল্‌ম থেকে, মহান আল্লাহর ভয়শূন্য ক্বলব থেকে, অতৃপ্ত আত্মা থেকে এবং এমন দু'আ থেকে যা কবুল হয় না।"[১১৪]

শাকাল ইবনু হুমাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, তুমি বলো–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وِمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وِمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ وِمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ.

"হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই আপনার কাছে আমার শ্রবণের অনিষ্ট থেকে, আমার দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে, আমার জিহ্বার অনিষ্ট থেকে, আমার ক্বলবের অনিষ্ট থেকে এবং আমার লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে।"[১১৫]

পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে এরূপ অসংখ্য যিক্‌র রয়েছে, যা দ্বারা ক্বলব পরিষ্কার করা যায়। পরিশেষে লোকমান (আলাইহিস সালাম)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। একদা তাঁর মনিব তাঁকে একটি বকরী যবেহ করে ওর উৎকৃষ্ট দু'টি টুকরা নিয়ে আসতে বললেন। তিনি তার জিহ্বা ও ক্বলব নিয়ে আসলেন।

কিছুদিন পর পুনরায় তাঁর মনিব তাঁকে আর একটি বকরী যবেহ করতে বললেন এবং ওর নিকৃষ্ট দু'টি টুকরা আনতে বললেন। তিনি এবারও জিহ্বা ও ক্বলব নিয়ে আসলেন। তাঁর মনিব তখন বললেন, 'ব্যাপার কী? এটা কী ধরনের কাজ হলো? উত্তরে তিনি বললেন, 'এ দু'টি যখন ভালো থাকে তখন দেহের কোনো অঙ্গই এ দু'টির চেয়ে ভালো হতে পারে না। আবার এ দু'টি যখন খারাপ হয়ে যায় তখন সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস এ দু'টিই হয়ে থাকে।[১১৬]

পরিশেষে অভিশপ্ত শয়তান থেকে ক্বলব ও জিহ্বাকে যেন হিফাযত রেখে কিয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে পারি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এই তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

[১১৪] *সহীহ মুসলিম- রিয়াযুস্ সালেহীন- হা. ১৪৭৯।*
[১১৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৪৯২, হাদীস সহীহ।*
[১১৬] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ৩/৫৮৫ পৃ.।*

ক্বলব মানবদেহের চালিকাশক্তি : ক্বলব সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে, যেসব আয়াতে ক্বলবের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- "তাদের ক্বলবগুলোতে রোগ আছে।"[১১৭] "তাদের ক্বলব আছে, কিন্তু তারা তদ্বারা বুঝে না।"[১১৮] "তবে যদি তাদের ক্বলব থাকত, যা দ্বারা তারা বিবেচনা করবে।"[১১৯]

সহীহ হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন– "জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশ্‌তের টুকরা (মুদগা) আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীর তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীর তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সে গোশ্‌তের টুকরাটি হলো ক্বলব।"[১২০]

হারাম ও সন্দেহজনক কার্যাবলী থেকে বাঁচতে চাইলে প্রথম স্বীয় আকল বা বিবেককে ঠিক করতে হবে। কারণ, মানুষের বিবেকই মানবদেহরূপী কারখানার জন্য চালক যন্ত্রস্বরূপ। মানবের কর্তব্য, তার বিবেক-বুদ্ধিকে ঠিক রেখে তারপর সেই সুষ্ঠু জ্ঞান-বিবেকের দ্বারা স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পরিচালিত করা।

এই হাদীস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বের ইঙ্গিতদানে মানবের প্রকৃত উন্নতির উপায় নির্দেশ করা হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে যে স্থূল দেহের উন্নতি অপেক্ষা আত্মার (বিবেকের) উন্নতির ওপরই মানুষের প্রকৃত ও মূল উন্নতি নির্ভর করে। আত্মার বা বিবেকের উন্নতি সাধিত না হলে মানবজীবন বিফল ও অত্যন্ত বিড়ম্বনায় পতিত হয়।

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'মুদগা' বলে মানবদেহের যে বিশিষ্ট অংশটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, সে অংশটি হচ্ছে আকল বা বিবেক। এর উন্নতিতে পূর্ণ মানবদেহের উন্নতি এবং এর অবনতিতে সম্পূর্ণ মানবদেহের অবনতি ঘটে থাকে। অর্থাৎ- বিবেক রত্নটির উন্নতি সাধিত হলে সমগ্র মানবদেহের উন্নতি হবে এবং তার অবনতিতে সমগ্র মানবদেহেরই অবনতি ঘটবে।

এখন দেখতে হবে যে ওই অংশটির উন্নতির অর্থ কী। বস্তুত প্রতিটি জিনিসের উন্নতি বা অবনতি বিচার করা হয় তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনের ওপর। তাই এখানে দেখতে হবে যে বিবেকের ওপর কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। কারণ, বিবেক বলে যার নামকরণ করা হয়েছিল,

[১১৭] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১০।*
[১১৮] *সূরা আল আ'রাফ : ১৭৯।*
[১১৯] *সূরা আল হাজ্জ : ৪৬।*
[১২০] *সহীহুল বুখারী- প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৯-৪০, হা. ৫০।*

তার কর্তব্য ছিল সদাচার, সততা, সত্যতা ও মহান আল্লাহর বশবর্তিতা ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নফসের মধ্যে যে অপশক্তি আছে, তাদের বশে এনে ফেরেশ্তার সৎ গুণাবলিতে পরিচালিত করা। অতএব, বিবেকের দায়িত্ব ও কর্তব্যও তা-ই হবে। এই মহান কর্তব্য পালনে বিবেক যতটুকু উন্নতি করতে পারবে, পূর্ণ মানবদেহটি ততটুকুই উন্নতি লাভ করবে। পক্ষান্তরে বিবেক নিজের ওই কর্তব্যে ত্রুটি করে নিজেই যদি প্রবৃত্তির বশ্যতা স্বীকার করার অবনতিতে পতিত হয়, তাহলে পূর্ণ মানবদেহই অবনতির অন্ধকার গর্তে পতিত হবে।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিশারদেরা বিবেকের উন্নতির পাঁচটি স্তর বর্ণনা করেছেন :

(১) মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে যিক্র করা।

(২) আল্লাহর মহৎ গুণাবলির ধ্যান করা এবং ওই ধ্যানের দ্বারা নিজের মধ্যে ওই গুণের প্রতিবিম্ব হাসিল করা।

(৩) মহান আল্লাহর গুণাবলির তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করা।

(৪) মহান আল্লাহর গুণে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে মহান আল্লাহর আশেক ও প্রেমিকে পরিণত হওয়া এবং নিজের নফসের সব কুপ্রবৃত্তির প্রতি ঘৃণা জন্মানো এবং সেগুলো ফানা ও বিলুপ্ত করে দেওয়া। অর্থাৎ- সেগুলোকে পূর্ণরূপে দখল ও অধিকার করার সামর্থ্য অর্জন করা।

(৫) মহান আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া, যাকে মহান আল্লাহর খেলাফত লাভ বলে। এ অবস্থাতেই বিবেক ও আকলের পূর্ণ শুদ্ধি হয়ে যায়। এই অবস্থার পর আর বিবেক ও আকলকে কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হতে হয় না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মানবের স্বীয় আকল ও বিবেককে সঠিক করার যে প্রেরণা দান করেছেন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবাত্মার চরম ও পরম উন্নতির উচ্চপর্যায়।[১২১]

বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ তাফসীরে মাজহারিতে কাজি সানাউল্লাহ পানিপথি (রহিমাহুল্লাহ) ক্বলবের ব্যাখ্যায় লিখেছেন : "ক্বলব এমন একটি বিষয়, যা বোধ ও জ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর "ক্বলব"-এর রোগ হলো মূর্খতা, হিংসা, কুফ্র ও মন্দ ধারণা বা বদ 'আক্বিদাহ্ (ভুল বিশ্বাস)।"[১২২]

প্রখ্যাত তাফসিরকারক আল্লামা মাহমুদ আলুসি বাগদাদি (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ রুহুল মাআনিতে ক্বলবের ব্যাখ্যা লিখেছেন : "আর ক্বলব বলা হয় আল্লাহ প্রদত্ত আলোকিত জ্ঞানী সত্তাকে, যা মহান আল্লাহর নূর অবতরণের স্থল, মানুষের কারণেই মানুষ পদবাচ্য হয়, এর দ্বারাই মানুষ নির্দেশ পালন ও নিষেধ বর্জনে সক্ষম হয়। বহু মুহাক্কিক মত দিয়েছেন যে, এই ক্বলবই হলো জ্ঞানের উৎস, বলা হয়েছে নিশ্চয় তা হলো মস্তিষ্কে; আর তা হলো ঈমানের কেন্দ্রস্থল।"[১২৩]

সুবিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ তাফসীরে রুহুল বায়ান-এ শাঈখ ইসমাঈল হাক্কি (রহিমাহুল্লাহ) ক্বলবের ব্যাখ্যা লিখেছেন, 'ক্বলব হলো জ্ঞানশক্তির কেন্দ্রস্থল, যাকে বিবেক বলা হয়, আর "ক্বলব" দ্বারা বোধ ও বিবেক উদ্দেশ্য হয়, যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয় এর মধ্যে তাদের জন্য উপদেশ রয়েছে, যাদের 'ক্বলব' আছে (অর্থাৎ- 'আকল' আছে)।"[১২৪]

প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক আবুল হাসান আলী আল মাওয়ারিদি (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ আদাবুদ দ্বীন ওয়াদ দুনিয়ায় 'আকল ও হাওয়া (জ্ঞান ও রিপু)' অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরছেন, "আকল হলো– যা আল্লাহ দ্বীনের মূল ও দুনিয়ার ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করেছেন।"

রাসূল (ﷺ)-থেকে বর্ণিত আছে, "মানুষ যা অর্জন করেছে, এর মধ্যে আকলের তুল্য আর কিছুই নেই, আকলই মানুষকে সঠিক পথ নির্দেশ করে এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে।"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে আরও বর্ণিত আছে– "মানুষের আকল অনুপাতে তার রবের 'ইবাদত সম্পাদিত হয়ে থাকে।"

'উমার ইবনু খত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "মানুষের মূল সম্পদ হলো তার আকল ও বিচার-বুদ্ধি।"

হাসান বসরি (রহিমাহুল্লাহ) বলছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যাকে আকল দান করেছেন, কখনো না কখনো সে তা প্রয়োগ করতে পারে।"

নিশ্চয় আকল দ্বারাই সবকিছুর প্রকৃত রূপ অনুধাবন করা যায় এবং ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। আকলের সঙ্গেই দায়িত্ব-বিধান সম্পর্কিত, এর দ্বারাই মানুষ ও সব প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য হয়।

সলিহ ইবনু আব্দুল কুদ্দুস (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "যখন মানুষের আকলের পূর্ণতা লাভ হয়, তখন তার সকল কিছুই পূর্ণ হয়।" বিশেষজ্ঞরা আকল প্রসঙ্গে বলেছেন, "তা হলো এক সূক্ষ্ম বস্তু, যা দ্বারা তথ্যের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করা যায়। এর স্থান হলো মস্তিষ্ক।"[১২৫] *[চলবে ইন্শা-আল্লাহ]*

---

[১২১] *বুখারী- প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭১-৭৪, হা. ৪৭, আল্লামা আজীজুল হক।*
[১২২] *তাফসীরে মাজহারি- প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩ ও ২৬।*
[১২৩] *রুহুল মা'আনি- প্রথম খণ্ড, পৃ. ২২০ ও ২২১।*
[১২৪] *তাফসীরে রুহুল বয়ান- প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৮।*
[১২৫] *মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উসমান গনী- প্রথম আলো, ২৮ অক্টোবর ২০১৬।*

ইতিহাস-ঐতিহ্য

ঐতিহাসিক গাদীরে খুম

খ্রিষ্টানদের সাথে নবী (ﷺ)-এর মুবাহালা

–শেখ আহসান উদ্দিন*

মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেওয়ার আগে জীবনের শেষদিকের ঘটনাগুলো ইসলামের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মধ্যে বিদায় হজ্জ, গাদীরে খুম ও নাজরানে খ্রিষ্টানদের সাথে মুবাহালা বিতর্কের ঘটনা অন্যতম। অনেকেই হয়ত গাদীরে খুম বিষয়ে কিছুই জানে না। অথবা জানলেও শী'আসহ ভ্রান্ত মতবাদিদের বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত তাই এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু লিখলাম।

বিদায় হজ্জ ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মদিনার জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তিনটি গুরুত্বপূর্ণ খুতবাহ্ দেন যেগুলো ক্রমান্বয়ে ০৯ জিলহজ্জ আরাফার ময়দানে, ১০ জিলহজ্জ মিনায় এবং ১৮ জিলহজ্জ বিদায় হজ্জ শেষে মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার পথে গাদীরে খুম নামক স্থানে। বিদায় হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শেষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা হতে মদীনার দিকে যাত্রা করেন এবং ১৮ জিলহজ্জ-এর দিন 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে পৌঁছেন ও সেখানে যাত্রাবিরতি করেন। এটি ছিল মক্কা হতে তিন মাইল দূরে 'জোহফা' নামক স্থান, যা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। 'গাদীর' অর্থ পুকুর। এখানে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি খুৎবাহ্ প্রদান করেন। এটিকে বলা হয় 'গাদীরে খুম'-এর খুৎবাহ্।

'গাদীরে খুম'-এ নবীজি (ﷺ) যখন খুৎবাহ্ প্রদান করেন তখন 'আলী ইবনু আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই দিন নবীজি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সাহাবায়ে কিরাম ও আহলুল বাইতের সদস্যরা সবাই উপস্থিত হয়েছিলেন। যোহরের নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গাদীরে খুমের সেই খুৎবাহ্ প্রদান করেন। যাতে তিনি তার মৃত্যু সন্নিকটে হবার ইশারা করেন এবং কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার তাকীদ করেন।

সেই সাথে আহলুলবাইত বা নবী পরিবারের সদস্যদের প্রতি ভালোবাসা মহব্বতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সেখানে তিনি বলেন :

«مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ».

আমি যার মাওলা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার মাওলা।[১২৬]

এ বিষয়ে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য হলো এই যে, 'খুম' কূয়ার নিকট পৌঁছে বুরাইদাহ্ আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকটে ইয়ামন যুদ্ধের সফরে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর রুক্ষ ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করেন। এতে রাসূল (ﷺ)-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'হে বুরাইদাহ্! আমি কি মু'মিনদের নিকট তাদের নিজের চাইতে অধিক নিকটতর নই? বুরাইদাহ্ বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ﷺ) বলেন,

«مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ».

এর অর্থ হলো– 'আমি যার বন্ধু, 'আলী তার বন্ধু।'[১২৭]

সাহেবে মিরক্বাত বলেন, শী'আরা এর অর্থ করেছে– ''আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাসন ক্ষমতাসহ সকল কাজে রাসূল (ﷺ)-এর স্থলাভিষিক্ত। অথচ এর অর্থ কেবল 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা।'[১২৮] শাইখ আলবানী বলেন, শী'আরা এখানে হাদীস তৈরি করেছে 'সে আমার পরে খলীফা' যা কোনো সূত্রেই বিশুদ্ধ নয়; বরং এটি তাদের রচিত অগণিত মিথ্যাসমূহের অন্যতম।'[১২৯] এভাবে শী'আরা রাজনৈতিক কারণে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মর্যাদা বর্ণনায় তিন লাখ জাল হাদিস বানিয়ে নিয়েছেন। ড. মুস্তফা সিবায়ী, আস-সুন্নাহ ফিত-তাশরী'ইল ইসলামী।[১৩০]

দ্বিতীয়তঃ ২৪ জিলহজ্জ মুবাহালার ঘটনা যা ৯ম অথবা কারোমতে ১০ম হিজরীতে নাজরানের খ্রিষ্টানদের সাথে হয়েছিল।

৯ম হিজরীতে নাজরান থেকে খ্রিষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল নবী করীম (ﷺ)-এর কাছে এসে তারা যে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে অতিরঞ্জনমূলক 'আক্বীদাহ্ রাখত, সে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিলো। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় এবং মহানবী (ﷺ) তাদেরকে মুবাহালার আহ্বান জানান।

তিনি 'আলী, ফাতিমাহ্ এবং হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-দেরকে সাথে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন এবং খ্রিষ্টানদেরকে বলেন যে, তোমরাও তোমাদের

* *শিক্ষার্থী বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইওট, বিবিএ ১ম বর্ষ, অনার্স। সূত্রাপুর, ঢাকা।*

[১২৬] *সুনান আত্ তিরমিযী- তাহক্বীক্বকৃত, হা. ৩৭১৩, সহীহ।*
[১২৭] *আহমাদ- হা. ২২৯৪৫, ২২৯৯৫; মুস্তাদরাক হাকেম- হা. ৪৫৭৮।*
[১২৮] *মিরক্বাত- হা.৬০৯১-এর ব্যাখ্যা।*
[১২৯] *সিলসিলাতুল সহীহাহ্- হা. ১৭৫০-এর আলোচনা।*
[১৩০] *বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী- ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৫হি./১৯৮৫ খ্রি., ৮১ পৃ.।*

পরিবারের লোকদের সাথে নিয়ে এসো। তারপর আমরা মিথ্যাবাদীর উপর অভিশাপ বর্ষণের বদ্দুআ করব। খ্রিষ্টানরা পরামর্শ করে মুবাহালা করার পথ ত্যাগ করে বলল যে, আপনি আমাদের কাছে যা চাইবেন, আমরা তা-ই দিব। সুতরাং রাসূল (ﷺ) তাদের উপর জিযিয়া-কর ধার্য করে দেন। আর এই কর আদায়ের জন্য তিনি আমীনে উম্মত (উম্মতের বিশ্বস্তজন উপাধি লাভকারী) আবূ উবায়দাহ্ ইবনু জাররাহ (রাঃ)-কে তিনি তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন।[১৩১] হাদীস শরীফে এসেছে–

হুযাইফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজরান এলাকার দু'জন সরদার আকিব এবং সাইয়্যিদ রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে তাঁর সঙ্গে মুবাহালা করতে চেয়েছিল। বর্ণনাকারী হুযাইফাহ্ (রাঃ) বলেন, তখন তাদের একজন তার সঙ্গীকে বলল, এরূপ করো না। কারণ আল্লাহর কসম! তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন আর আমরা তাঁর সঙ্গে মুবাহালা করি তাহলে আমরা এবং আমাদের পরবর্তী সন্তান-সন্ততি (কেউ) রক্ষা পাবে না। তারা উভয়ে রাসূল (ﷺ)-কে বলল, আপনি আমাদের নিকট হতে যা চাবেন আপনাকে আমরা তা-ই দেব। তবে এর জন্য আপনি আমাদের সঙ্গে একজন আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিন। আমানতদার ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে আমাদের সঙ্গে পাঠাবেন না। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই এমন একজন আমানতদার পাঠাবো যে প্রকৃতই আমানতদার এবং পাক্কা আমানতদার। এ পদে ভূষিত হওয়ার জন্য রাসূল (ﷺ)-এর সহাবীগণ আগ্রহান্বিত হলেন। তখন তিনি বললেন, হে আবূ 'উবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ্! তুমি উঠে দাঁড়াও। তিনি যখন দাঁড়ালেন, তখন রাসূল (ﷺ) বললেন : এ হচ্ছে এই উম্মতের সত্যিকার আমানতদার।[১৩২] ❑

ঈদের জামা'আত

ঢাকা মহানগরীসহ পার্শ্ববর্তী ইলাকার আহলে হাদীসদের ঈদুল আয্হা'র প্রধান জামা'আত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে **সকাল ৭টায়** অনুষ্ঠিত হবে ইন্শা-আল্লাহ। এছাড়াও মাদ্রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া (যাত্রাবাড়ি) মাঠে, মিরপুর এম.ডি.সি স্কুল মাঠে, বারিধারা লেক সংলগ্ন মাঠে, মোহাম্মদপুর সলিমুল্লাহ রোড সংলগ্ন মাঠে, টঙ্গী বাজার আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংলগ্ন হাইস্কুল মাঠে ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হবে ইন্শা-আল্লাহ। সকল জামাআতে মহিলাদের সালাত আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

[১৩১] *ইবনু কাসীর এবং ফাতহুল ক্বাদীর ইত্যাদির সারাংশ।*
[১৩২] *বুখারী- হা. ৩৭৪৫, ই. ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হা. ৪০৩৫।*

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেল-এর ঈদ শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী মুসলিম উম্মাহ-সহ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সকল স্তরের নেতাকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীগণকে পবিত্র ঈদুল আয্হা'২৩-এর **শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ** জানিয়েছেন।

«تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ».

"তাক্বাব্বালাল্লা-হু মিন্না- ওয়া মিনকুম।"

এক বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, মহান আল্লাহর অত্যন্ত পছন্দনীয় একটি 'ইবাদত কুরবানী। ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ'র আত্মত্যাগের মহান কীর্তিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার অভিপ্রায়ে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে এই কুরবানীকে কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য বিধান হিসেবে ঘোষণা করেন। নিছক পশুর গলায় ছুরি চালানোর নাম কুরবানী নয়; বরং ইসলামের প্রতিটি বিধান বাস্তব জীবনে প্রতিফলনের জন্য যাবতীয় স্বার্থ ত্যাগ করে নিজেকে আল্লাহ তা'আলার সমীপে উৎসর্গ করার নাম কুরবানী। এই কুরবানী থেকে আমরা তাযকীয়া-এ নাফস তথা আত্মশুদ্ধির শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আমলে সালেহ-এর প্রদর্শনী এবং বাহ্যিক পরহেযগারিতা থেকে বের হয়ে এসে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনে প্রকৃত তাক্বওয়ার গুণ অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অতএব আসুন! আমরা পবিত্র ঈদুল আয্হা থেকে ত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ করি এবং সকলপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, অপতৎপরতা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা এবং বিভেদ-বিসংবাদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ গঠনে সচেষ্ট হই।

নোটিস

পবিত্র ঈদুল আয্হা- ১৪৪৪ উপলক্ষে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় বন্ধ থাকবে। অতএব, আগামী ০৩ জুলাই-২০২৩ সোমবার সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশিত হবে না। তৎপরিবর্তে ৬৪ বর্ষ, ৩৯-৪০ সংখ্যা আগামী ১০ জুলাই- ২০২৩ সোমবার প্রকাশিত হবে ইন্শা-আল্লাহ।

–সম্পাদক

কিশোর ভুবন

উম্মে মাবাদের তাঁবুতে রাসূল (ﷺ)

–আবু তাসনীম*

রাসূল (ﷺ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকালে খোযাজা গোত্রের উম্মে মাবাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। উম্মে মাবাদ নামকরা স্বাস্থ্যবান মহিলা ছিলেন। হাতে হাঁটু ধারণ করে তাঁবুতে বসে থাকতেন ও মুসাফিরদের পানাহার করাতেন।

রাসূল (ﷺ) উম্মে মাবাদকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নিকট কিছু আছে কি?

তিনি বললেন,

"আমার নিকট যদি কিছু থাকত তাহলে মহান আল্লাহর ওয়াস্তে অবশ্যই আমি আপনাকে মেহমানদারি করাতাম। ঘরে তেমন কিছু নেই, বকরীগুলো রয়েছে অনেক দূর দূরান্তে।"

সেই সময়টা ছিল দুর্ভিক্ষ কবলিত।

রাসূল (ﷺ) দেখলেন, তাবুর এককোণে একটি বকরী বাঁধা রয়েছে।

তিনি বললেন, হে উম্মে মাবাদ! এটা কেমন বকরী?

উম্মে মাবাদ বললেন, বকরীটি অনেক দুর্বল ও জীর্ণ শীর্ণ, তাই তাকে পালের বাইরে রাখা হয়েছে।

নবী (ﷺ) বললেন, ওর ওলানে কি দুধ আছে?

উম্মে মাবাদ বললেন, দুধ দেওয়ার মতো কোনো শক্তি নেই।

রাসূল (ﷺ) বললেন, অনুমতি দিলে আমি তাকে দোহন করি।

মহিলা বললেন, হ্যাঁ। আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। যদি আপনি তার দুধ দেখতে পান তাহলে অবশ্যই দোহন করবেন।

এরপর রাসূল (ﷺ) বকরীর ওলানের উপর হাত দিলেন। মহান আল্লাহর নাম নিলেন এবং দু'আ করলেন, অতঃপর বকরীটা তার পেছনের পা দু'টো বিস্তার করল এবং তার ওলান দুধে ভরপুর হয়ে উঠল।

রাসূল (ﷺ) উম্মে মাবাদের বেশ বড় আকারের একটি পাত্র নিলেন এবং এত পরিমাণ দুধ দোহন করলেন যে, দুধের ফেনা পাত্রের উপরে উঠে গেল। দুধ দোহনের পর তিনি উম্মে মাবাদকে পান করালেন। তিনি দুধ পানে পরিতৃপ্ত হলেন।

অতঃপর রাসূল (ﷺ) সঙ্গী-সাথীদের পান করালেন সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে পান করানোর পর নিজে পান করলেন।

দ্বিতীয়বারেও তিনি এত পরিমাণ দুধ দোহন করলেন যে, তার পাত্র ভরে গেল। তিনি দুধ উম্মে মাবাদের কাছে রেখে মদীনার দিকে অগ্রসর হলেন।

কিছুক্ষণ পর তার স্বামী আবূ মাবাদ সেখানে আসলেন। পাত্রে দুধ দেখে তিনি আশ্চার্যান্বিত হলেন এবং তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ তুমি কোথায় পেলে?

দুগ্ধবর্তী বকরীগুলো তো চারণভূমিতে আছে। বাড়িতে কোনো দুগ্ধবর্তী বকরী ছিল না। সেক্ষেত্রে পাত্রে এত দুধ কোথা থেকে আসলো।

উম্মে মাবাদ তার স্বামীকে সেই বরকতময় মেহমানের কথা জানালেন।

যিনি পথ চলার সময় তার গৃহে আগমন করেছিলেন এবং তার সাথে যা ঘটেছিল তা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। সে কথা শুনে আবূ মাবাদ বললেন, এত ঠিক সেই লোক বলে মনে হচ্ছে– যাকে কুরাইশরা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আবূ মাবাদ তার স্ত্রীকে বললেন, আচ্ছা তার আকৃতি প্রকৃতি বর্ণনা করো দেখি।

উম্মে মাবাদ অত্যন্ত আকর্ষনীয়ভাবে তার গুণাবলী ও যোগ্যতার এমন একটি নকশা অঙ্কন করলেন, তাতে মনে হলো শ্রোতা যেন তাকে চোখের সম্মুখেই দেখছেন। মেহমানের এই সকল গুণের কথা শুনে আবূ মাবাদ বললেন–

ওয়াল্লাহু! ইনি তো কুরাইশদের সেই সাথী, লোকেরা যার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার কথা বলছেন। আমার ইচ্ছা তার বন্ধুত্ব গ্রহণ করি, যদি কোনো পথ পাই তাহলে অবশ্যই তা করব। ❑

* *আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

কবিতা

ঈদের ছড়া

মোল্লা মাজেদ*

ঈদের খুশী মহা খুশী
ধুম পড়েছে ধুম
খুশী ভরা ঈদ নিশীথে
নেই যে কারো ঘুম।
ঈদের খুশী ঈদের দিনে
কেউ ধরেছে বায়না
কেউ বা অনেক অভিমানে
ঈদে কিছুই চায় না।
এমন দিনে হচ্ছে কারো
কোর্মা পোলাও রান্না
চাই না সে ঈদ যে ঈদে রয়
অনাথ শিশুর কান্না।

ছোট্ট মুখে বড় কথা

মো. আব্দুল হাই*

ছোট মুখে বড় কথা বলা বড় শক্ত,
চুপ করে আছি বসে কেটে যায় অক্ত।
সবখানে তোষামোদি স্বার্থের খাতিরে,
তেলাতেলি দলাদলি এই খেল জাতিরে।
খেতে খেতে সব গেল, শিক্ষাও বাদ নেই,
প্রশ্নের ফুঁসফাস মেধাবীদের কাজ নেই।
প্রাইমারী হতে শুরু ভার্সিটির শেষ ফাঁদে,
চাকরিরও শেষ ভায়া, অসহায় দেশ কাঁদে।
ভাই মামা দাদা খালু, থাকে যদি নাও পিছু,
না থাকলে অভাজন, নিজে করে খাও কিছু।
দূনীর্তি, ঘুষ আর জালিমদের ঝাড়িতে,
মুখ ফুটে বলি যদি, ফিরবোনা বাড়িতে।
খাবারেও বিষ দিয়ে, তৃপ্তিতে চোখ বুঁজি,
প্রজন্ম শেষ করেও, শান্তির পথ খুঁজি।
নেশা আর নষ্টামী, তরুণরা হলো শেষ,
বিজাতীয় কালচারে, ছেয়ে গেল গোটা দেশ।
টুপি দাড়ি পোশাকেও ব্যবসার ফাঁদ পেতে,
ঈমানটা গেল তবু, দুনিয়ায় আছি মেতে।
এই বাবা ঐ বাবা, কত শত বাবাতে,
হারালাম দুই কুল-ই, শয়তানের থাবাতে।
অন্যায় দেখেও তবু, আমি কিছু দেখিনি,
এক পা কবরে, তবু কিছু শিখিনি।
তাই ভালো চুপচাপ, মেনে নেই অন্যায়,
ভাসুক না দেশ তবে জুলুমের বন্যায়।
আমি নিজে ভালো আছি, আর কিছু চাই না,
দুঃখিদের কান্নায়, দুঃখ খুঁজে পাই না।
হঠাৎ আমিও যেদিন, বিপদের খপ্পরে,
একা একা যাব চলে, যমরাজের দপ্তরে।
এমন করেই দেখি, দিন থেকে রাত হয়,
জানিনা কবে ফের, সত্যের হবে জয়।

কেন পারবো না?

আসিম বিন নূরুল ইসলাম*

কেন পারবো না আমি, সৎ বান্দা হতে?
শয়তান মোরে বাধা দেয়, সহজ-সরল পথে।
কেন পারবো না আমি, রবের প্রিয় হতে?
পারতে হবে তা আমায়, যেতে চাই জান্নাতে।
কেন পারবো না আমি, দ্বীনের দায়ী‘ হতে?
প্রস্তুতি নিচ্ছি তাই, কঠিন পথে যেতে।
কেন পারবো না আমি, শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে?
মানবতা শিখবো তবে, সেবা ছড়িয়ে দিতে।
কেন পারবো না আমি, সেরা লেখক হতে?
ভেবে যায় লিখার প্রহরে, বিধির বিধান থেকে।
কেন পারবো না আমি, বড় কবি হতে?
ভেসে যেতে চাই– কাব্য সাগরে, ঈমানী চেতনার রথে।
কেন পারবো না আমি, কৃতজ্ঞ বান্দা হতে?
শুকরিয়া করি তাই, রবের নিয়ামতে।

ওয়াহীর পথ

মুহাম্মাদ আরাফাত ইসলাম সেলিম*

চলবো মোরা ওয়াহীর পথে
কে যাবে চলো রে সাথে
আল্লাহ তা‘আলা মোদের সাথে আছে
কুরআন হাদীস হাতের মুঠোয়।
চলো রে যুবক চলো রে
দ্বীন ইসলামের পথে চলো রে
দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে সব
অগ্রপানে সবাই চলো রে।

---

* *রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী- ৭৭২০।*
* *সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক, কেন্দ্রীয় শুব্বান।*

* *সানুবিয়া ১ম বর্ষ, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ্‌।*
* *দারুল উলূম সালাফী লাইব্রেরী, লালবাগ সদর, দিনাজপুর।*

জমঈয়ত সংবাদ

মুন্সিগঞ্জে মসজিদ উদ্বোধন

মুন্সিগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী থানার কে. শিমুলিয়া উইনিয়নের পূর্ব আলদি গ্রামে 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নামে একটি আহলে হাদীস মাসজিদ গত ১৯ মে শুক্রবার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী জুমু'আর খুতবাহ্ প্রধান করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। সালাতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি, বিশিষ্ট সমাজ সেবক আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন। আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আলী হোসেন, কে. শিমুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আনিছুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো. মিজানুর রহমান, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মো. আকমল হোসেন, মো. ছিদ্দিকুর রহমান, আবূ বাক্কার ছিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামে মসজিদ ও মোহাম্মদীয়া আইডিয়াল মাদ্‌রাসার সেক্রেটারি মো. নাছির উদ্দিন বেপারী, মোহম্মদ মজিবুর রহমান মাস্টার এবং 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা আওলাদ হোসেন হাওলাদার।

তালীমী বোর্ডের বিভাগীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ (চট্টগ্রাম বিভাগ)

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস পরিচালনাধীন বাংলাদেশ আহলে হাদীস তালীমী বোর্ডের দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন (চট্টগ্রাম বিভাগ) গত ১০ জুন শনিবার সকাল ১০টায় শুরু হয় এবং ১১ জুন রবিবার বিকাল ৫টায় সফলভাবে সমাপ্ত হয়। চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলায় অবস্থিত দারুস সালাম সালাফিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়রম্যান আলহাজ্জ আবুল হাশেম-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। চট্টগ্রাম বিভাগের ত্রিশোর্ধ্ব প্রতিষ্ঠান থেকে সত্তরের অধিক প্রশিক্ষণার্থী এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে খ্যাতিমান প্রশিক্ষকবৃন্দসহ উলামায়ে কিরাম বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি ও বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক আধুনিক আরবী ভাষার প্রয়োগিক দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি ও বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, জমঈয়ত সহ-সভাপতি ও বোর্ডের কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ শাইখ মোফাযযল হুসাইন মাদানী, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারি জেনারেল ও বোর্ডের রেজিস্ট্রার শাইখ ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী নির্ধারিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এছাড়া অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ ও শাইখ মুস্তাফিজুর রহমান মাদানী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ উপস্থাপন করেন।

এতদ্ব্যতীত চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়খালী, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর ও বান্দরবান জেলায় অবস্থিত আহলে হাদীস মানহাজের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, সেক্রেটারি, প্রধান শিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী সুধী সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দারুস সালাম সালাফিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান আলহাজ্জ আবুল হাশেম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি ও তা'লীমী বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা পেশ করেন জমঈয়ত সেক্রেটারি জেনারেল ও বোর্ডের রেজিস্ট্রার শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন কুমিল্লা জেলা জমঈয়তের সভাপতি অধ্যক্ষ শফীকুর রহমান সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত সহ-সভাপতি শাইখ মোফাযযল হুসাইন মাদানী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী খলীলুর রহমান বাচ্চু। প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম ও সুধী সমাবেশ পরিচালনা করেন বোর্ডের প্রশাসনিক কর্মকর্তা শাইখ আনোয়ারুল ইসলাম মাদানী।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে অংশগ্রহণকারী সকল প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বোর্ডের পক্ষ থেকে সনদপত্র এবং জমঈয়ত ও বোর্ডের মাধ্যমে দুই খণ্ডের কুরআনুল কারীমের তাফসীর ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।

সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তের পরিচিতি ও মত বিনিময় সভা

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার ঐতিহ্যবাহী সাতলাঠি কেন্দ্রীয় মসজিদে সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা এবং সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা জমঈয়ত সভাপতি মাওলানা মো. আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে গত ১৮ জুন রবিবার সকাল ১০টায় প্রোগ্রাম শুরু হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা ও কামারখন্দ উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল হক। এতে সকল সাংগঠনিক উপজেলা/এলাকার বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের একটি প্রতিনিধি দল এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অন্যতম সহ-সভাপতিদ্বয় প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী ও প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী, সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন, অর্থ-উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেক্রেটারি সৈয়দ মুহাম্মদ জুলফিকার আলী, প্রচার ও গণ সংযোগ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ রায়হান উদ্দীন, অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেক্রেটারি চৌধুরি মোনিনুল ইসলাম এবং বগুড়া জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক শাইখ একেএম শামসুল আলম।

স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কামারখন্দ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম শহীদুল্লাহ সবুজ, কামারখন্দ এলাকা জমঈয়তের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ কামরুল হাসান আমিনুল, জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা মুহাম্মদ আব্দুল হক, জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি শাইখ মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন ইয়াহইয়া, তাড়াশ এলাকা জমঈয়তের সভাপতি ও জেলা সহ-সভাপতি শাইখ মুহাম্মদ দাউদ হোসেন, জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল হক, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হাকীম ও মুহাম্মদ খায়রুল বারী, রায়গঞ্জ এলাকা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা লুৎফর রহমান, চৌহালী এলাকা জমঈয়তের সভাপতি মুহাম্মদ আবু সাঈদ মাস্টার, তাড়াশ এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল গাফফার, বেলকুচি এলাকা জমঈয়তের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার সরকার, জেলা জমঈয়তের শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, দফতর দম্পাদক মুহাম্মদ শামীম হোসেন, শাহাজাদপুর এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, ছোটো খাটো মতানৈক্য পরবর্তীতে মতদ্বন্দ্বে পরিণত হয়। কিন্তু আমাদেরকে ইসলাম ও জমঈয়তের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ব্যক্তি মুখ্য নয়; বরং সাংগঠনিক ইমেজ ও স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

দু'আর আবেদন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ-এর ছোটো ভাই আব্দুল্লাহ আল হাফিজ হার্টের গুরুতর অসুস্থতা নিয়ে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, মিরপুরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার আরোগ্যের জন্য সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

মৃত্যু সংবাদ

রাজশাহী (পশ্চিমাঞ্চল) জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুর রহমান কারামীর বড়ো ছেলে (হাসান মাসউদ) গত ০৬ জুন মঙ্গলবার মটর সাইকেল দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন। মাইয়্যিতের মাগফিরাতের জন্য সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ থেকে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

ত্বক দেখেই বুঝবেন কোন রোগে আক্রান্ত

আমাদের শরীরের সব অংশজুড়ে বিস্তৃত রয়েছে ত্বক। ত্বকের মাধ্যমে নানা রোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ফলে লক্ষণ দেখেই বুঝা যায় শরীরের মধ্যে কোনো রোগ বাসা বেঁধেছে। তাই ত্বকের যতই যত্ন নিন না কেন, শরীরে ভেতরের কোনো সমস্যা থাকলে তার প্রভাব চেহারায় পড়ে।

বিশেষ করে মুখে ব্রণ, দাগছোপ, শুষ্ক ত্বক- এসব কিন্তু শরীরের অভ্যন্তরীণ কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে। চোখের ফোলা, চোখের নিচে কালি– এসবও শারীরিক সমস্যার লক্ষণ। তাই শত রূপচর্চা করলেও কমবে না এসব সমস্যা বরং চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো।

সুস্থ্য থাকতে হলে ত্বকের নানা সমস্যার পেছনে শারীরিক সমস্যা আছে কিনা? সবার এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা উচিত।

ব্রণের সমস্যায় পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে প্রায় সবাই ভোগেন। বিশেষত তৈলাক্ত ত্বকে ব্রণ, ফুসকুড়ি, ব্রেকআউট লেগেই থাকে। কারণ তৈলাক্ত ত্বকের ছিদ্র বা পোর্স বন্ধ হয়ে যায়। আর এর ফলেই বাড়তে থাকে ব্রণের সংখ্যা। এছাড়া বয়ঃসন্ধি, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, মেনোপজ, পিরিয়ডের সমস্যা এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার কারণে ব্রণ হতে পারে।

অতিরিক্ত মানসিক চাপের কারণে ত্বকে অ্যান্ড্রোজেন হরমোন ক্ষরণ হয়। ফলে তৈলাক্ত ত্বক আরও বেশি তৈলাক্ত হয়ে ওঠে। যে কারণে ব্রণ আরও বেশি হয়।

একজিমা এমন একটি চর্মরোগ, যা ত্বককে লাল করে তোলে। একজিমার ফলে ত্বক শুষ্ক, জ্বালা এবং চুলকানি হয়। অত্যধিক মানসিক চাপের কারণে একজিমা হতে পারে। অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। একবার একজিমা হলে তা সহজে নির্মূল হতে চায় না।

সোরিয়াসিস ত্বকের বিভিন্ন জায়গায় হয়ে থাকে। সাদা আঁশের মতো খসখসে শুকনো অংশ হয়। এতে ত্বক লালচে হয়ে ফুলে ওঠে। তার ওপর থেকে আঁশের মতো ছাল উঠতে থাকে। অটো ইমিউন ডিজঅর্ডার থেকে এ ধরনের ত্বকের সমস্যা হয়।

গোলাপি বা লালচে শরীরের যে কোনো জায়গায় দেখা দিতে পারে। তবে সাধারণত পেট, উরু ও স্তনে বেশি দেখা যায়। মূলত শরীরের অতিরিক্ত ওজন এবং গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে এ সমস্যা হয়।

আর্দ্র রাখার ক্রিম লাগানোর পরও যদি ত্বক শুষ্ক থাকে এবং চুলকানি হয় তা হলে তা এটোপিক ডার্মাটাইটিসের লক্ষণ হতে পারে। এ অবস্থার কারণে ত্বকে ফাটা ও চুলকানি হতে পারে। এর সঙ্গে হাঁপানি, হে ফিভার ও অন্যান্য অ্যালার্জিও দেখা দিতে পারে।

মানসিক চাপের প্রভাবে সোরিয়াসিস বা একজিমা আরও খারাপ পর্যায়ে যেতে পারে। এর ফলে ক্রমাগত ব্রণ, ভঙ্গুর নখ, চুল পড়া, আমবাত এবং ঘাম হওয়া বাড়তে পারে।

তাছাড়া অতিরিক্ত মানসিক চাপের ফলে মুখে ও চোখের পাশে বলিরেখা ফুটে ওঠে। ত্বক শুষ্কও হয়ে যেতে পারে। তবে মানসিক চাপ কমানোর কৌশল অনুসরণ করলে ত্বকের অনেক সমস্যা প্রতিরোধ হতে পারে।

ত্বক ভালো রাখতে নিয়মিত ত্বকের সঠিক যত্ন নিতে হবে। প্রতিদিন প্রচুর পানি পান করতে হবে, সকালে এবং রাতে ভালোভাবে মুখ পরিষ্কার রাখতে হবে। প্রতিদিন ব্যায়াম ও পর্যাপ্ত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভিটামিন গ্রহণ করতে হবে। এসব নিয়ম সঠিকভাবে মেনে চলতে পারলেই ত্বক থাকবে স্বাস্থ্যকর ও উজ্জ্বল।

‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র উপদেশ

‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিখ্যাত তাবি‘য়ি ও পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব আহনাফ ইবনু কায়স (রহিমাহুল্লাহ)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে এই দামি কথাগুলো বলেছিলেন :

১. যে খুব বেশি হাসাহাসি করে, তার মর্যাদা কমে যায়।

২. যে অধিক ঠাট্টা-মশকরা করে, তার ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য লোপ পায়।

৩. যার মধ্যে কোনো একটি বিষয় বেশি দেখা যায়, সেটাকে ঘিরেই সমাজে তার পরিচিতি ছড়ায়।

৪. যে বেশি কথা বলে, সে বেশি ভুল করে।

৫. যে বেশি বেশি ভুল করে, তার লজ্জা কমে যায়।

৬. যার লজ্জা কমে যায়, তার ভেতর মহান আল্লাহর ভয় কমে যায়।

৭. যার আল্লাহভীতি কমে যায়, তার অন্তর মরে যায়।

(ইবনুল জাওযি, সিফাতুস সাফ্ওয়াহ- ১/১৪৪৯)

আসুন! মহান আল্লাহকে ভয় করি, মৃত্যুকে স্মরণ রেখে পথ চলি, সুন্নতি জীবন গড়ি।

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১) : ***মক্কাবাসী কোনো ব্যক্তি 'উমরাহ্ করতে চাইলে কোথা থেকে ইহরাম বাধবে? আসলে কী মক্কাবাসীর জন্য 'উমরাহ্ করা আবশ্যক? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

ইলিয়াস উদ্দীন
তানোর, রাজশাহী।

জবাব : মক্কাবাসীগণ নিজ নিজ অবস্থান স্থল হতে হজ্জের ইহরাম বাধবেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৫২৬ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১১৮১)*। আর ইচ্ছা করলে 'উমরাও পালন করতে পারেন। যদি কোনো মক্কাবাসী 'উমরাহ্ করতে চান, তাহলে তাকে হারাম সীমানার বাইরে তথা হিল্লে গিয়ে ইহরাম পরে 'উমরাহ্ পালন করতে হবে। আর হিল্ল হলো মীক্বাত অভ্যন্তরে হারাম সীমানার বাইরের জায়গা– *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৫৬০ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১২১১)*।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***যে হাজীর উপর কুরবানী করা ওয়াজিব; অথচ অর্থাভাবে করতে পারেননি, তার জন্য কী বিধান রয়েছে?***

আবুল ফজল
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : ক্বিরান ও তামাত্তু হজ্জকারী ব্যক্তি– চায় পুরুষ কিংবা মহিলা হোন– তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। এটি সম্পাদন ব্যতীত হজ্জ আদায় হবে না। তাই ইসলামী শরিয়ত এর জন্য সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে। কোনো হাজী কুরবানীর সামর্থ্য হারিয়ে ফেললে তিনি হজ্জ সফরে তিনটি সিয়াম পালন করবেন এবং দেশে ফিরে এসে আরো ৭টি সিয়াম রাখবেন। অর্থাৎ- তাকে কুরবানীর বদলে ১০টি সিয়াম রাখতে হবে। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ৭টি সিয়াম ধারাবাহিকভাবে কিংবা ভেঙ্গে ভেঙ্গে রাখতে পারবেন। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৬)*

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***হাজীগণ মীনাতে কুরবানী না করতে পারলে কোথায় কুরবানী করবেন? দয়া করে জানিয়ে উপকৃত করবেন।***

মুস্তাক আহমদ
গাইবান্ধা সদর।

জবাব : মীনা হলো কুরবানীর নির্ধারিত স্থান। কোনো কারণে সেখানে কুরবানী না করতে পারলে মক্কার যে কোনো স্থানে কুরবানী করলেই চলবে। মক্কার বাইরে কিংবা নিজ দেশে কুরবানী করলে চলবে না। *(ফাতওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ- ফা. ৯৮১৮)*

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***কুরবানীর পশুর চামড়ার বিধান জানতে চাই। এটি মূলত কাদের হক্ব? দয়া করে জানাবেন।***

মুমিনুল ইসলাম
তালা, সাতক্ষীরা।

জবাব : কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করা বা হাদিয়া দেওয়া যাবে না।

عَنْ عَلِيٍّ (رضي الله عنه) قَالَ : أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) أَنْ أَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُوْدِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا.

"আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার (কুরবানীর) উটের কাছে দাঁড়াতে বললেন। আর এ কথাও বললেন, যেন আমি এর মাংস ও চামড়া দান করে দেই এবং তা থেকে যেন শ্রমিককে বিনিময়স্বরূপ কিছু না দেই"– *(বুখারী- হা. ১৭১৭ ও মুসলিম- হা. ১৩১৭)*। কুরবানীদাতা প্রয়োজন মনে করলে তা নিজে ব্যবহার করতে পারেন। আর তা নাহলে তিনি এটি কোনো গরীব-মিসকীনকে সাদাক্বাহ্ করে দেবেন। যদি তিনি বিক্রি করেন, তাহলে তার সমুদয় মূল্য গরীদের মাঝে বন্টন করে দেবেন– *('যাদুল মুস্তাক্বনি' আ' - ইবনু 'উসাইমীন, ৭/৫১৫)*।

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***কতটুকু সামর্থ্য থাকলে কুরবানী দিতে হবে? কুরবানী দেওয়া কি আবশ্যক? কুরআন-হাদীস দিয়ে উত্তর দেবেন।***

মাহবুব আলম
শীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

জবাব : কুরবানী করার জন্য কী পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে- এ মর্মে কোনো বর্ণনা নেই। সংসারের

নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর একটি ভেড়-বকরী বা এক সপ্তমাংশ গরু বা উটে শরীক হওয়ার মতো অর্থ থাকলেই কুরবানীর জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

"অতএব তুমি তোমার রবের জন্য সালাত আদায় করো এবং কুরবানী দাও!"– *(সূরা আল কাউসার : ২)*। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا.

"যার কুরবানী করার মতো সামর্থ্য আছে; অথচ কুরবানী করেনি, সে যেন আমাদের ঈদের সালাত আদায়ের স্থানের নিকটবর্তী না হয়"– *(আহমাদ- ৮২৭৩; ইবনু মাজাহ্- হা. ৩১২৩)*। উপরোক্ত দলিল দ্বারা একদল আলেম কুরবানী করা ওয়াজিব মনে করেন। আবার অপর শ্রেণি তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলেন। এ পুণ্যময় কাজটি আল্লাহর বিশেষ নির্দশন। তাই সামর্থ্যবানদের উচিৎ কোনো অজুহাতে অবহেলা না করে সাধ্যমতো কুরবানী করে যাওয়া। -ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৬) : গরু না খাসী কোন্‌টি কুরবানী উত্তম? এ ব্যাপারে কি কোনো দলিল আছে? দয়া করে উল্লেখ করলে বাধিত হবো।

মো. নূরুল ইসলাম
ডেমরা, ঢাকা।

জবাব : হজ্জে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উট কুরবানী করেছিলেন। তাছাড়া বাকি সময়ে খাসী-দুম্বা কুরবানী করেছেন। এ জন্য কোন্ পশু কুরবানীর জন্য উত্তম, তা নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে। অধিকাংশ আলেমের মতে সর্বোত্তম হলো উট। তার পর যথাক্রমে গরু, খাসী ও দুম্বা। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ফযীলতের ধারাবাহিকতায় এরূপ বিন্যাস করেছেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮৮১ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৮৫০)*। উম্মাতের জন্য সহজলভ্য মনে করে খাসী কুরবানী দিয়েছেন। এর দ্বারা খাসী উত্তম তা বুঝায় না। -ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৭) : শরীকে তথা ভাগে কুরবানী দেওয়া যাবে কী? আমাদের দেশের কেউ কেউ এ ব্যাপারে আপত্তি করেন। তাই বিষয়টি স্পষ্ট করলে ভালো হয়।

মুহা. মুরাদুজ্জামান
মুজিবনগর, মেহেরপুর।

জবাব : উত্তম হলো একটি কুরবানী দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি বকরি কুরবানী দিয়েছেন– *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৬৭; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৭৯২ ও সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩১২২)*। আর কেউ চাইলে উট বা গরুতে শরীকে কুরবানী করতে পারেন। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। অতএব এ ব্যাপারে আপত্তি করা জ্ঞানের স্বল্পতার নামান্তর।

জিজ্ঞাসা (০৮) : কোনো ব্যক্তি কুরবানীর নিয়ত করে ভুলক্রমে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে কুরবানীর আগে নখ-চুল কেটে ফেলে, তাহলে তার করণীয় কী?

মুহাম্মদ আইয়ুব আলী
মুন্সিগঞ্জ সদর।

জবাব : ১০ যিলহজ্জ বা ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে কুরবানী করার পর নখ-চুল কাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। কোনো কারণে কেউ ভুলক্রমে কুরবানীর আগে নখ-চুল কেটে ফেললে তার উপর কোনো শাস্তি বর্তাবে না। তার এ ভুল মার্জনীয় বলে বিবেচ্য।

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

"হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করে ফেলি, তাহলে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮৬)*

জিজ্ঞাসা (০৯) : ঈদের সালাতের আগে কেউ কুরবানী করে ফেললে তার করণীয় কী? তার কুরবানী কি আদায় হয়ে যাবে, না পুনরায় কুরবানী করতে হবে?

আব্দুল খালেক
মালদ্বীপ প্রবাসী।

জবাব : ঈদের সালাতের পর কুরবানী করা বিধিবদ্ধ। কোনো ব্যক্তি সালাতের আগে কুরবানীর পশু যবেহ করে ফেললে তার কুরবানী আদায় হবে না; বরং তাকে যথা নিয়মে আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে। এরূপ করতে দেখে রাসূল (ﷺ) বলেন :

«مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى».

"সালাত আদায়ের পূর্বে যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু যবেহ করে ফেলে, সে যেন এটির পরিবর্তে আরেকটি পশু কুরবানী করে"– *(সহীহ বুখারী- হা. ৫৫৬২; সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৬০ ও সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩১৫২)*। -ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১০) : *কোন্ দিন কুরবানী করা উত্তম? ১০ যিলহজ্জ, না আইয়্যামে তাশরীক্বের যে কোনো একদিন হলেই হলো?*

আব্দুল্লাহ জুবায়ের
শরিয়তপুর।

জবাব : ১০ যিলহজ্জ হচ্ছে কুরবানীর দিন। এ দিন কুরবানী করা উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ দিনকে বড়ো হজ্জ বলে অভিহিত করেছেন– *(সূরা আল হাজ্জ : ৩)*। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বড়ো হজ্জের দিন বলতে ১০ যিলহজ্জের দিনকে বুঝিয়েছেন– *(সহীহ আবূ দাউদ- আলবানী, হা. ১৭০০)*। কোনো কারণে সে দিন কেউ কুরবানী করতে না পারলে আইয়্যামে তাশরীক্বের যে কোনো একদিন করলেই চলবে– *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৪১৯; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৭৭৩ ও সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৩০০৪)*। -ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১১) : *ঈদের তাকবীর দেওয়ার সময়* اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا *"আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাসীরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাঁও ওয়া আসীলা" এ তাকবীর বলা যাবে কী?*

ওয়াহীদ
সিরাজগঞ্জ।

জবাব : আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) কুরবানীর দিনগুলোতে বেশি বেশি তাকবীর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাকবীরের বাক্য হিসেবে–

اَللهُ أكبر اللهُ أكبر اللهُ أكبر لا إله إلا اللهُ، واللهُ أكبر اللهُ أكبر اللهُ أكبر ولله الحمد.

"আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা- ইলাহা ইল্লাল্লা-হু আল্লা-হু আকবার" বাক্যটি সাহাবীগণ বলতেন– *(ইরওয়া- মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ্, ৩/১২৫)*। আর প্রশ্নে উল্লেখিত বাক্যটি মূলত সালাতে সানার পরিবর্তে পড়ার নির্দেশনা রয়েছে। তবে এটিতে তাকবীরের বাক্য থাকায় তা ঈদের তাকবীর হিসেবে বলার মধ্যে কোনো দোষ নেই– *(আস-সান'আনী 'সুবুলুস সালাম'- ২/৭২)*। -ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১২) : *কুরবানীর একটি গরুর একাংশ সন্তানের 'আক্বীক্বাহ্ হিসেবে দেওয়া যাবে কি? এ মাসআলায় কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে আহলে হাদীসের অবস্থান জনতে চাই।*

ইবাদুর রহমান বাদল
আমলা, কুষ্টিয়া।

জবাব : 'আক্বীক্বাহ্ ও কুরবানী দু'টি দু'ধরনের 'ইবাদত। সন্তানের 'আক্বীক্বাহ্ ছেলে হলে দু'টি ছাগল এবং মেয়ে হলে একটি ছাগল দ্বারা আদায় করতে হয়– *(আহমাদ- হা. ৬৭১৩; আবূ দাউদ- হা. ২৮৪২; আন্ নাসায়ী- হা. ৪২২৩)*। ছাগল ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী দ্বারা 'আক্বীক্বাহ্ রাসূল (ﷺ) দেননি। অনেকে কুরবানীর উপর ক্বিয়াস করে গরু দ্বারা 'আক্বীক্বাহ্ জায়িয বলেন। তবে এটা হাদীসের যথাযথ অনুকূলে নয়। আর কুরবানীর গরুতে শরীক হয়ে 'আক্বীক্বাহ্ দেয়া কোনো সালাফে সালেহীন থেকেও প্রমাণিত হয়নি। কাজেই কুরবানীর সাথে 'আক্বীক্বাহ্ দেয়া সঠিক হবে না।

জিজ্ঞাসা (১৩) : *মসজিদ মহান আল্লাহর ঘর। এ ঘরের পবিত্রতা রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব। আমার জিজ্ঞাসা– মসজিদে কোনো অন্যায় হলে বাইরের অন্য জায়গার তুলনায় পাপ কি বেশি হবে? আশা করি সঠিক উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।*

সুলাইমান সাকিব
সাভার, ঢাকা।

জবাব : মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা এবং এর আদবের ব্যাপারে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। কা'বা ঘরে কোনো অন্যায় করলে আল্লাহ তা'আলা মর্মন্তুদ শাস্তির কথা বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ﴾

"আর যে ব্যক্তি তাতে (কা'বায়) যুল্‌ম তথা শির্ক-এর দিকে ঝুঁকবে, আমি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবো।" *(সূরা আল হাজ্জ : ২৫)*

মসজিদে কোনো অন্যায় করা হারাম। একদা দু'জন আগন্তুক মসজিদে নাববীতে উচুঁ আওয়াজে কথা বললে খলীফা 'উমার (رضي الله عنه) খুব রাগান্বিত হলেন এবং বললেন : তোমরা মেহমান না হলে তোমাদেরকে আমি প্রহার করে ব্যাথা দিতাম। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৭০)*

যদিও উপরোক্ত ধমকী ক্বা'বা ও মসজিদে নববীর বেলায় বলা হয়েছে, তবুও পৃথিবীর সকল মসজিদ মহান আল্লাহর ঘর হওয়ায় সেগুলোর পবিত্রতা রক্ষা করাও অপরিহার্য। এসব পবিত্র স্থানে 'আমল করলে

যেমন বেশি সাওয়াব রয়েছে; ঠিক তেমনি কোনো অন্যায় করলেও এর পরিণাম হবে ভয়াবহ। শরিয়তে অপরাধের ভয়াবহতার কথা বলা হলেও কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। তাই অপরাধের পরিমাণ ও শাস্তি মহান আল্লাহই ভালো জানেন। আমাদেরকে সকলপ্রকার অন্যায় থেকে দূরে অবস্থান করতঃ মহান আল্লাহর ঘরগুলোর যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করা উচিৎ।

জিজ্ঞাসা (১৪) : সফরে সালাত ক্বসর করার বিধান রয়েছে। যদি কেউ ক্বসর না করে পুরা সালাত আদায় করে, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে কী? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

মো. আবূ তাহের বাদল,
বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

জবাব : সফর অবস্থায় ক্বসর করা মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীর অন্যতম। ইসলাম যে সর্বজনীন এবং সহজ দ্বীন, এটাই তার প্রমাণ। সফরের ক্লান্তির মাঝে আল্লাহ তা'আলা সালাতকে ক্বসর করার সুযোগ দিয়েছেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে ক্বসর করাই উত্তম। তবে কেউ চাইলে পুরো সালাত আদায় করাতে কোনো অসুবিধা নেই। ক্বসর করার বিধানের দলিলেই এটার প্রমাণ বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾

"আর যখন তোমরা যমীনে চলো, তখন সালাত ক্বসর করাতে কোনো দোষ নেই। যদি তোমরা কাফিরদের ফিতনার আশংকা করো। নিশ্চায়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন"– *(সূরা আন্ নিসা : ১০১)*। নাবী (ﷺ)-কে ভয়-ভীতি ছাড়া ক্বসর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (ﷺ) বলেন : "এটি একটি সাদাক্বাহ্। আল্লাহ তদ্বারা তোমাদেরকে সাদাক্বাহ্ করেছেন। কাজেই তোমরা তার সাদাক্বাকে গ্রহণ করো"– *(মুসলিম- ৬৮৬)*। সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মিনায় সফর অবস্থায় 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিছনে ৪ রাকআত সালাত আদায় করেছেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ১০৮৪ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৬৯৫)*। অনুরূপভাবে 'আয়িশাহ্ ও সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে সফরে ৪ রাকআত সালাত আদায় করেছেন মর্মে প্রমাণ রয়েছে– *(ইবনুল মুনযির- ৪/৩৩৫)*।

উপরোক্ত দলিলসমূহ পর্যালোচনা করলে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, চাইলে কোনো মুসাফির মুক্বিমের ন্যায় পুরো সালাত আদায় করতে পারেন। আর যদি মহান আল্লাহর হাদিয়া গ্রহণ করে ক্বসর করেন, তাহলে সেটি উত্তম বলে বিবেচিত হবে।

জিজ্ঞাসা (১৫) : আমাদের সমাজের কোথাও কোথাও দেখা যায় ঈদের সালাত সর্বদা মসজিদে আদায় করেন। আবার বেশিরভাগ খোলা মাঠে আদায় করে থাকেন। বিশুদ্ধতার দিক থেকে মূলতঃ কোন্‌টি ঠিক?

ফায়সাল আহমাদ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

জবাব : ঈদের সালাত খোলা মাঠে আদায় করা সুন্নাত– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৯৫৬ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৮৮৯)*। আমরা সামান্য খেয়াল করলে দেখতে পাবো– মসজিদে নববীর মতো কেন্দ্রীয় মসজিদ থাকা সত্ত্বেও প্রিয় নাবী (ﷺ) উন্মুক্ত ময়দানে ঈদের সালাত আদায় করেছেন। শরঈ কারণ ছাড়া মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৬) : আমার জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তা দিয়ে আমার পরিবারের বাৎসরিক খরচ নির্বাহ করি; কোনো কোনো বছর হয়তো কিছু উৎবৃত্ত হয়। এখন প্রশ্ন হলো– আমার ওপর কি হজ্জ ফরয হয়েছে?

মুহা. রাসেল
খানসামা, দিনাজপুর।

জবাব : একজন মুসলিমের ওপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য যে দু'টি বিশেষ শর্তারোপ করা হয়েছে, তা হলো– শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য। আর আর্থিক সামর্থ্যের সঠিক কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে দেননি; বরং আমাদের ঈমানের সত্যতার প্রমাণের ওপর রেখে দিয়েছেন। সহজ অর্থে এখানে সামর্থ্য বলতে হজ্জ সফরে যাওয়ার, সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করার এবং সফরকালীন সময় পরিবারবর্গকে প্রয়োজনীয় খাবার ব্যবস্থা করে যাওয়াকে বুঝায়। এতটুকু আর্থিক সামর্থ্য হলে হজ্জ ফরয হয়ে যাবে। প্রশ্নে উল্লেখিত বর্ণনানুসারে বুঝা যায়– তিনি পর্যাপ্ত সম্পদের অধিকারী নন। এমতাবস্থায় উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করার পর যখন দেখা যাবে যে, তার পক্ষে হজ্জের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব, তখনই তার উপর হজ্জ ফরয হবে, অন্যথায় নয়। *(সূরা আ-লি 'ইমরান : ৯৭; সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮৬; আল উদ্দা শারহুল উমদাহ- ১/১৭৮ পৃ.)*

জিজ্ঞাসা (১৭) : ***আমরা সালাতের মধ্যে সাব্বি হিসমা রব্বিকাল আ'লা শুনে বলি– সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা। অন্য কিছু সূরাতেও এভাবে জবাব দিয়ে থাকি। এ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।***

আমীর হামযা
জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট।

জবাব : সালাতে সূরা আল 'আলা'র প্রথম আয়াত "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" পড়ার পর "সুবহানা রাব্বিয়ালা 'আলা" বলার ব্যাপারে কোনো মারফূ' হাদীস নেই। ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসটি মাওকুফ যা সাহাবীদের 'আমল। আর ক্বাতাদাহ্ হতে বর্ণিত হাদীসটি মুরসাল। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় তাদলীস রয়েছে। কাজেই সার্বিক বিবেচনায় এরূপ না বলাই ভালো। তবে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনাটির ধারাবাহিকসূত্র সহীহ হওয়ায় মাওকুফ হওয়া সত্ত্বেও কেউ চাইলে 'আমল করতে পারেন। ***(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪/৩৯; ইবনু হাজার 'আত্ তাকরীব- ১; আদ্ দুররুল মানসুর- ৬/৩২৬ পৃ.)***

আর সূরা আর্ রহ্মা-ন-এর ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ আয়াতখানা পড়ার পর তার জবাবে বর্ণিত বাক্যটি একাধিক সূত্রে 'আমলযোগ্য প্রমাণিত হয়। তাছাড়া অন্যান্য আয়াতের জবাবে কোনো কিছু বলার সঠিক কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৮) : ***স্বামীর সম্পদ আছে কিন্তু স্ত্রীর তেমন কোনো সম্পদ নেই। এমতাবস্থায় স্ত্রীকে হজ্জ করানো স্বামীর ওপর ফর্য হবে কি?***

মো. নূর হোসেন
আগাসাদেক রোড, ঢাকা।

জবাব : হজ্জ ফর্য হওয়ার জন্য নিজের মাল থাকা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

"আর আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষের ওপর বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফর্য, যে সেথায় পৌঁছার সামর্থ্য রাখে"– ***(সূরা আ-লি 'ইমরান : ৯৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৮)***। যেহেতু স্ত্রীর নিজের হজ্জ সফর আঞ্জাম দেয়ার আর্থিক সামর্থ্য নেই, তাই তার ওপর হজ্জ ফর্য হবে না। আর স্বামী তার স্ত্রীর হজ্জ করিয়ে দিতে বাধ্য নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা একের দায়িত্ব অন্যের ওপর চাপিয়ে দেন না। যদি স্বামী নিজ অর্থ ব্যয় করে স্ত্রীর হজ্জ করিয়ে দেয়, তাহলে তা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ইহসান বলে বিবেচিত হবে।

জিজ্ঞাসা (১৯) : ***বর্তমান সময়ে বেশ কিছু এম. এল. এম. কোম্পানির তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। তাদের প্রধান কাজ হলো পণ্য বিক্রি করা এবং বিক্রিত পণ্য থেকে "ওয়ান স্টার" থেকে "টেন স্টার" পর্যন্ত প্রায় ৬০% কমিশন গ্রহণ করা হয়। এ গ্রুপে কাজ করে অর্থ উপর্জন বৈধ হবে কি?***

মাকসুদুর রহমান নোমান
উজিরপুর, বরিশাল।

জবাব : এম. এল. এম কোম্পানির ব্যবসানীতি অস্পষ্ট। তাতে প্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে এবং অন্যের হক্ব সুকৌশলে আত্মসাৎ করার প্রবণতা বিদ্যমান। কাজেই এটা জায়িয নয়– ***(সহীহ মুসলিম- হা. ১০২; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৩১৫)***। এ ধরনের ব্যবসাকে গারার বা অজ্ঞাত ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন :

«نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গারার (অজ্ঞাত ক্রয়-বিক্রয়) হতে নিষেধ করেছেন। ***(সহীহ মুসলিম- হা. ৪/১৫১৩; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৩৭৬, সহীহ; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১২৩০, সহীহ; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪৫১৮, সহীহ; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২১৯৫)***

জিজ্ঞাসা (২০) : ***আমরা সহীহ হাদীসের অনুসারীদের কাছ থেকে জেনেছি যে, নিয়্যাত মনের সংকল্পের নাম। মুখে উচ্চারণ করা বিদআত। তাহলে হাজীদেরকে কেন উচ্চারণ করে لبيك حجا বলতে শিখানো হয়? এটা কি মুখে নিয়্যাত পাঠ নয়? এ সংক্রান্ত সন্দেহ দূর করার স্বার্থে দলিলসহ ব্যাখ্যা করলে ভালো হয়।***

আয়েশা সিদ্দিকা
কুড়িগ্রাম।

জবাব : হজ্জে প্রবেশের সময় প্রিয় নাবী (ﷺ) এভাবে উচ্চারণ করে لبيك حجا বলেছেন– ***(মুসলিম- হা. ১২৩২)***। এটি হজ্জের নিয়্যাত নয়; বরং হজ্জের প্রবেশের ঘোষণা মাত্র। ইমাম ত্বাবারী, কুরতুবী ও ইবনু কাসীর (রহিমাহুমুল্লাহ) এই 'লাব্বাইক' বলাকে মহান আল্লাহর ডাক– وأذن في الناس بالحج-এর জবাব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কাজেই এটিকে কোনোভাবে তথাকথিত নিয়ত বলা যাবে না– ***(আল-বাস্সাম "তাওযীহুল আহকাম"- ৩/৩৩৮)***। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সুস্পষ্ট নিদর্শন সাফা ও মারওয়া

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত সুস্পষ্ট দু'টি নিদর্শন হলো সাফা ও মারওয়া নামের দু'টি পাহাড়। যা সৌদি আরবের মক্কা নগরীর মসজিদ আল-হারাম সংলগ্ন অবস্থিত। এই পাহাড়দ্বয় হজ্জ ও 'উমরার সাথে সম্পর্কিত। হজ্জ ও 'উমরার অংশ হিসেবে এই পাহাড় দু'টির মাঝে সাতবার সাঈ' বা আসা-যাওয়া করতে হয়। হজ্জ ও 'উমরায় হাজী সাহেবদের জন্য সাফা-মারওয়া সাঈ' করা ফর্‌য।

ইতিহাস : কুরআন থেকে যতদূর জানা যায় আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার মুখোমুখি করেছিলেন তার মধ্যে ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর জন্ম গ্রহণের পর এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো তাঁকে। পরীক্ষাটি ছিলো আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার আদেশে স্ত্রী হাজেরা এবং প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে সিরিয়া থেকে মক্কার মরুভূমিতে রেখে যেতে হয়েছিল একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে স্বল্প পরিমাণ পানি দিয়ে। তখন মক্কা ছিল নির্জন ধু ধু মরুপ্রান্তর। এটি ছিল এমন একটি উপত্যকা, যেখানে মানুষ তো দূরের কথা কোনো পশু-পাখিরও অস্তিত্ব ছিল না। তখন স্ত্রী হাজেরা ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে চিৎকার করে বলেন, হে ইব্‌রা-হীম! আপনি আমাদের কার কাছে রেখে যাচ্ছেন? এমন এক ময়দানে, যেখানে না আছে কোনো সাহায্যকারী না আছে পানাহারের কোনো বস্তু। তিনি বার বার এ কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম) সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। তখন হাজেরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এর আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন? ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম) জবাব দিলেন, হ্যাঁ। একথা শুনে হাজেরা বললেন আমি মহান আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আপনি তাহলে যান। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের ধ্বংস ও বরবাদ করবেন না। তারপর হাজেরা ফিরে আসলেন। ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-ও নিজ গৃহ অভিমুখে ফিরে চললেন। ইসমা'ঈলের মা বিবি হাজেরা ইসমা'ঈলকে বুকের দুধ খাওয়াতেন আর নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। পরিশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তখন তিনি নিজেও তৃষ্ণার্ত হলেন এবং তার শিশুপুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। এমন পরিস্থিতিতে কী করবেন হাজেরা! অস্থির হয়ে তিনি ছুটে চলেন পাহাড়ের দিকে। একবার সাফা পাহাড়ে আরোহণ করেন, আবার সেখান থেকে নেমে আসেন। আর ফিরে দেখেন নিজের কলিজার টুকরা শিশু ইসমা'ঈল এখনো বেঁচে আছেন কি না? ঢালুতে এলেই কলিজার টুকরা তাঁর চোখের আড়াল হয়ে যেত, তাই তিনি দৌড়ে পার হন, আর আরোহণ করেন মারওয়ায়। এভাবে তিনি সাতবার দৌড়ান। হাজেরা যখন নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন, তখন মহান আল্লাহর রহমত নাযিল হলো। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আগমন করলেন এবং শুষ্ক মরুভূমিতে পানির একটি ঝর্ণাধারা বইয়ে দিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছে হাজেরার এই দৌড় এতটাই পছন্দ হয়েছে যে হজ্জ ও 'উমরায় সাফা-মারওয়া সাঈ' করা ফর্‌য করে দিয়েছেন। (এ ঘটনাকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যেই সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাতবার দৌড়ানো কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য হজ্জের বিধি-বিধানে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে)। সীরাত-ই মুহাম্মদ বিন ইশাক নামক গ্রন্থে রয়েছে যে সাফা পাহাড়ের উপর আসাফের এবং মারওয়া পাহাড়ের উপর নায়েলার মূর্তি ছিল। তাদের একজন পুরুষ লোক ও অপরজন স্ত্রীলোক ছিল। এই অসৎ ও অসতী দু'জন কাবা গৃহে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের পাথরে পরিণত করেন। কুরাইশরা তাদের কা'বার বাইরে রেখে দেয় যেন জনগণ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষ তাদের পূজা করতে আরাম্ভ করে এবং তাদের সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে এনে দাঁড় করিয়ে তাদের তাওয়াফ শুরু করে। তাই ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মদিনার আনসারেরা সাফা-মারওয়া সাঈ' দূষণীয় মনে করত। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সাফা-মারওয়ার দোষ-এর কথা জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আয়াত নাযিল করে বলেন সাফা-মারওয়া সাঈয়ে কোনো দোষ নেই অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাফা-মারওয়া সাঈ' করেছেন।

অবস্থান : 'সাফা' ও 'মারওয়া' সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে অবস্থিত কা'বার নিকটবর্তী দু'টি ছোট পাহাড়ের নাম। যা যথাক্রমে বৃহত্তর আবূ কুবাইস এবং কাইকান

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

পর্বতগুলোর সাথে সংযুক্ত। কা'বার উত্তর-পূর্ব কোণে মাতাফ বা কা'বা চত্বর ঘেঁষেই সাফা পাহাড়ের অবস্থান। সাফা পাহাড় কা'বা ঘর থেকে প্রায় ১০০ মি. (৩৩০ ফুট) দূরে অবস্থিত। মারওয়া কা'বা থেকে ৩৫০ মি. (১১৫০ ফুট) দূরে অবস্থিত। সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব ৩০০ মি. (৯৮০ ফুট)।

কুরআনে সাফা-মারওয়ার উল্লেখ : আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পবিত্র কুরআনে সাফা-মারওয়াকে হজ্জ ও 'উমরায় সাঈ করতে বলেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ﴾

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে কিংবা 'উমরাহ্ করবে তার কোনো অপরাধ হবে না যে, সে এগুলোর সা'ঈ করবে। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কল্যাণ করবে, তবে নিশ্চয় শোকরকারী, সর্বজ্ঞ।" *(সূরা আল বাক্বারাহ : ১৫৮)*

হাদীসে সাফা-মারওয়ার উল্লেখ : সাফা-মারওয়ার ব্যাপারে অনেক হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) كَانَ إِذَا طَافَ فِيْ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (ﷺ) মক্কায় উপনীত হয়ে হজ্জ বা 'উমরাহ্ উভয় অবস্থায় সর্বপ্রথম যে তাওয়াফ করতেন, তার প্রথম তিন চক্করে রামল করতেন এবং পরবর্তী চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলতেন। তাওয়াফ শেষে দু'রাকআত সালাত আদায় করে সাফা ও মারওয়ায় সা'ঈ করতেন। *(বুখারী- হা. ১৬১৬)*

আমাদের জন্য শিক্ষা : আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি হাজেরার বিশ্বাস থেকে আমাদের এই শিক্ষা গ্রহণ করা যে, অনুকূল-প্রতিকূল যেকোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সাহায্য করতে পারেন ধারণাতীত জায়গা থেকে এবং মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রাখার পাশাপাশি নিজেও চেষ্টা করা ও উপায় অবলম্বন করা। যেমন হাজেরা-এর পানি শেষ হয়ে গেলে আপাতদৃষ্টিতে তখন কোনো উপায় ছিল না তাঁর কাছে। কিন্তু তিনি বসে না থেকে ধু ধু মরুপ্রান্তরে চেষ্টা করে ছিলেন। আর আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলাও পানির ব্যবস্থা করে দিয়ে ছিলেন। ❑

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর **কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের** জন্য জরুরি ভিত্তিতে একজন **অফিস সেক্রেটারি** নিয়োগ দেয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীকে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সভাপতি বরাবর নিম্নোক্ত ঠিকানায় সরাসরি/মেইলে দরখাস্ত প্রেরণের জন্য আহ্বান করা হলো।

❖ যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা :	❖ প্রয়োজনীয় সনদ ও বিষয় :
০১. দাওরা-ই হাদীস/কামিল/ মাস্টার্স (আরবী/ইসলামিক স্টাডিজ) পাশ হতে হবে। ০২. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। ০৩. অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ০৪. বাংলা, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় কম্পিউটার কম্পোজসহ অফিসেয়াল কাজ এবং অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।	০১. শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল কাগজের সত্যায়িত ফটোকপি, ০২. সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি রঙ্গিন ছবি, ০৩. এন.আই.ডি কার্ডের ফটোকপি অথবা নিজ এলাকার চেয়ারম্যান/কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সনদ, ০৪. সংশ্লিষ্ট জেলা জমঈয়ত কর্তৃক প্রত্যায়ন পত্র, ০৫. পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্তসহ।

❖ আবেদনের শেষ তারিখ : ১০/০৭/২০২৩ ইং

❖ আবেদন পাঠানোর ঠিকানা : ৭৯/ক/০৩, বিবির বাগিচা ০৩ নং গেইট, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

E-mail: jamiyat1946.bd@gmail.com

❖ যোগাযোগ : ☎ ০২ ২২৩৩৪ ২৮৩৪, ✆ ০১৯১৬ ৭০০৮৬৬, ০১৭১৬ ১০২৬৬৩